সমুদ্রস্নান

শ্যামলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

প্রকাশক : ফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক : দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
পি ২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা ৫৪

প্রচ্ছদ : সুবোধ দাশগুপ্ত

প্রথম সংস্করণ : ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫

সমুদ্রস্নান

সারারাত বৃষ্টির পর আকাশটা পরিষ্কার হয়েছে। ঝিকঝিক করছে ভোরের মিঠে রোদ। জেলেপাড়ার ছেলেরা আজ সবাই ব্যস্ত। কাল বৃষ্টির জন্য কেউ মাছ ধরতে বেরোয় নি। তাই আজ সূর্য ওঠার সংগে সংগে ওরা ওদের ভেলা-নৌকো আর জাল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। গোপালের মনটা আজ খুশী খুশী। এতদিন পর সর্দার নুলিয়ার মেয়ে লছমি ওকে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে।

ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্ন তার হঠাৎ ভেঙে চৌচির হয়ে গেল। হঠাৎ একটা সোরগোল। সেদিকে ছুটে গিয়ে দেখে বালুর ওপর পড়ে রয়েছে একটা মৃতদেহ। বেশ কিছুদিন সমুদ্রের জল খেয়ে ফুলে ঢোল। মাছে ঠুকরেছে জায়গায় জায়গায়। খানিকক্ষণ দেখার পর গোপাল গম্ভীর হয়ে গেল। বলল, থানায় নিয়ে চল।

থানায় দারোগাবাবু লাশটাকে দেখলেন। তারপর টেলিফোনে খবর পাঠালেন উর্ধ্বতন মহলে। আধ-ঘণ্টাটাক সময়ের মধ্যেই ইন্স্পেক্টর পট্টনায়ক এসে গেলেন। মৃতদেহটার দিকে একটু তাকিয়ে দারোগাবাবুকে বললেন, "থ্যাংক্স মহান্তি। ইউ হ্যাভ ডান্ এ গুড জব। আই অ্যাম পজিটিভ দিস ইজ্ মাই ম্যান।" পট্টনায়ক সাহেব অফিসে ফিরে গেলেন। নিজের চেম্বারে বসে সাদা দেওয়ালের দিকে খানিকক্ষণ চুপ করে চেয়ে রইলেন। তারপর একটা র‍্যাক থেকে বের করলেন লাল ফিতের বাঁধা মোটা একটা ফাইল। লাল পেন্সিলে ফাইলটার মলাটে বড় বড় করে লিখলেন, "কেস ক্লোজড্।"

২

দীর্ঘ বেলাভূমির বুকে ঢেউ-এর পর ঢেউ আছড়ে পড়ছে। বাতাসে ছড়ায় ঠাণ্ডা জলের কণা। পা ডুবে যায় বালুর গভীরে। পড়ন্ত আলোয় বিকেলের গরম বালু ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। হালকা বাসন্তী রং-এর শাড়ি আর গাঢ় নীল রং-এর স্লীভলেস ব্লাউজ গায়ে রতি ছুটে বেড়ায়। ছুটে বেড়ায় বসনের আলগা বাঁধনে তার দুরন্ত যৌবন।

"এই একটু পেছন ফিরে দাঁড়াও না।" বিমল সদ্য-বিবাহিতের কোমল গলায় আবদার করে।

বৈদিক যজ্ঞের মন্ত্রে অর্জিত অধিকারে সোচ্চার হয় তার দাবী। শক্ত মুঠিতে রতির একফালি মাখনের মত অনাবৃত কোমর চেপে ধরে তার শরীরটা ঘুরিয়ে দেয় বিমল। ক্লিক করে ওঠে তার কাঁধের ক্যামেরা। ফিলমের গায়ে ধরা পড়ে রতির শিথিল কবরী, শ্রোণীভার।

বিলিতি মতে সমুদ্রতীরে মধুচন্দ্রিমা পালন করতে এসেছে রতি আর বিমল। মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে হয়েছে তাদের বিবাহ, তাদের ফুলশয্যা। বিয়ের আগে তারা পরস্পরকে প্রায় চিনত না বলা চলে। বিমল শুধু একবার বাবার সঙ্গে মেয়ে দেখতে গিয়েছিল। সেদিন একটি তরুণী মেয়ের নরম সলাজ মুখ, ফেটে পড়া যৌবন দেখে সে মুগ্ধ হয়েছিল। কিন্তু রতি নামে যে মেয়েটির সঙ্গে শেষ পর্যন্ত তাকে ছাদনাতলায় বসতে হল, বাসর রাতেও সে তার কাছে ছিল অজানা। বাসর রাতে একটু রয়েসয়ে চলতে হয় এমন একটা অলিখিত নির্দেশ আছে। কালরাত্রিতে তো একেবারে ছাড়াছাড়ি। সত্যিকারের দেখা হল সেই ফুলশয্যার রাতে।

নারীদেহের রহস্য উন্মোচন করার ভেতর আছে যে কী মাদকতা বিমল সে রাতে প্রথম আবিষ্কার করল। আনন্দের সঙ্গে এল বিস্ময়। অল্প সময়ের মধ্যেই সে বুঝল, তার অনভ্যস্ত স্পর্শে রতি নামে সেই সলাজ মেয়েটির দেহ হঠাৎ মুখর হয়ে উঠেছে।

এ ক'দিনে সেই প্রথম রাতের উত্তেজনায় বেশ একটু ভাঁটা পড়েছে। বিমল মনে মনে স্বীকার করে। শরীরের আগুন একটানা জ্বালিয়ে রাখতে কেই বা পারে? দেহমনের আরও অনেক চাহিদা আছে। যেমন আহার, নিদ্রা; যেমন মনের জন্য বৈচিত্র্যের খোরাক। একদিক দিয়ে মধুচন্দ্রিমা জিনিসটার একটা উপকারিতা আছে। যে সময়টা প্রথামত দুজনে মুখোমুখি থাকার কথা তখন পারিপার্শ্বিকটা সুন্দর হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

সমুদ্রতীরে এসে ভালই হয়েছে। বিমল ভাবে। সমুদ্রের উদার সৌন্দর্য, বেলাভূমির নিঃসঙ্গতা, ঝাউগাছের পাতায় পাতায় বাতাসের সোঁ সোঁ শব্দ। সন্ধ্যাবেলায় দূরে মন্দিরের ঘন্টাধ্বনি। কখনও খা খা রোদ, কখনও মেঘ। বিমলের বিশ্বাস প্রকৃতি নামে যে নারী অনন্ত যৌবনা সেও বেশ আবেশ ছড়াতে পারে। প্রকৃতি আজ খানিকটা রতির পরিপূরক।

কিন্তু সেও বেশীদিন নয়। নিসর্গ প্রেমেও একঘেঁয়েমি আসে। বিমল ভাবে এদেশের যে সব ছেলেমেয়ে পাশ্চাত্যের ছেলেমেয়েদের মতো বিয়ের আগেই দেহমিলনের পর্বটা চুকিয়ে ফেলে তাদের কাছে মধুচন্দ্রিমা জিনিসটা নিশ্চয়ই একটা দুঃসহ ব্যাপার। চেনাদেহ নিয়ে আর কত মাতামাতি করা যায়। বিশেষ করে চেনাজানা আর সকলের কাছ থেকে দূরে চলে এসে।

তবু আমার ভাগ্য ভাল, বিমল নিজেকে বলে। শেষ আশ্রয় তার ক্যামেরা, তার বহুদিনের নেশা। ছোট বয়স থেকে সে ছবি তুলতে ভালবাসে। কলেজে থাকতে স্কলারশিপের টাকায় একটা ক্যামেরা কিনেছিল। ফোটোগ্রাফির ওপর বইও কেনে মেলা। শুধু কতগুলো নাম আর দু-একটা বড় বড় কথা মুখস্থ করেই সে খালাস নয়। শেখার চেষ্টা করে বিমল। আজ মধুচন্দ্রিমায় এসে সাগর-পারের বৈপরীত্যে-ভরা ব্যাকগ্রাউন্ডে সে রতির দেহের ভাঁজে ভাঁজে ফোটো-গ্রাফারের স্বর্ণখনি খুঁজে পেয়েছে।

বিছানায় আতপ্ত আনন্দ যখন দেহের শিথিলতায় টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে, বিমল তখন ছোটে তার পুরনো নেশার আমন্ত্রণে। নানা সাজে সাজায় রতিকে। নানা ভঙ্গিতে দৌড় করায় তাকে। ফোটোগ্রাফার বিমলের চোখ ঝকঝক করে ওঠে। জুড়ে দাও দু-চারটে মিষ্টি কথা—তামাম দুনিয়া মনে করবে প্রেমিকের চোখ হাসছে। রতিও বোধহয় তাই ভাবে। খিলখিল করে হাসে। দোদুল দোলে। ছুটে বেড়ায়। ফোটোগ্রাফার বিমল যখন দু হাতে তাকে জড়িয়ে ধরে, তাকে দাঁড় করিয়ে রাখে বুভুক্ষু লেনসের জন্য বিশেষ কোন পোজে, রতি কলকলিয়ে ওঠে। পুরোনো বাসি সব কথা। ক্লিক শব্দটি শোনা-মাত্র ছিটকে বেরিয়ে যায় অন্যদিকে।

বিমল তখন ধীরেসুস্থে একটা সিগারেট ধরায়।

৩

অবশেষে পেঁাছোনো গেল। মাকে তার করে দিতে হবে একটা। রোমান হরফে "নিরাপদে পেঁাছাইয়াছি"। নীলাঞ্জন ভাবে টেলিগ্রাম ফরমে একটি বাংলা কথা রোমান অক্ষরে লিখতে তার হাতে বেশ একটা জড়তা আসে। আর তার সহকর্মীরা—যাদের পেশা বাংলা সাংবাদিকতা—তাদের কত দীর্ঘ ডেস্‌প্যাচ এভাবে পাঠাতে হয়—কখনওবা সুদূর কোন রণাঙ্গন থেকে। দেশলাই সব ফুরিয়ে গেছে। শেষ হয়ে যাওয়া একটা সিগারেট থেকে আর একটা সিগারেট ধরায় নীলাঞ্জন।

শ্যামলী এর মধ্যেই রিক্‌শ থেকে নেমে পড়েছে। সাগরতীরের এই ছায়া সুনিবিড় ডেরায় মোটে দু-তিন হপ্তার জন্য আসা। তবুও সে তার সমস্ত সংসার নিয়ে এসেছে যেন। বিছানাপত্তর, হাঁড়ি, ডেচকি, ফ্লাস্ক আরও কত কি। নীলাঞ্জন মানা করেছিল। বলেছিল, ওদের পান্থশালায় সব ব্যবস্থাই আছে। কিন্তু সাংসারিক এসব ব্যাপারে সে যতই পাওয়ার শেয়ারিং-এর কথা বলুক না কেন, এখানে শ্যামলী ক্ষুদে একটা ডেস্‌পট। ক্ষমতাও আছে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই সব ব্যবস্থা হয়ে গেল। দরোয়ানের মুখে হাসি ফুটল। ঘরে মালপত্তর টানা হল। কুলিদের অল্পবিস্তর তর্জনগর্জনের পর বিদেয় করা হল। শ্যামলী ঘর গুছিয়ে নিল ক্ষিপ্র হাতে।

নীলাঞ্জন এক কোণে দাঁড়িয়ে সবকিছু দেখে। মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। নতুন সিগারেটটা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। শ্যামলী তার দিকে তাকিয়ে আত্মপ্রসাদের হাসি হাসল—ভাবটা যেন, দেখলে তো কেমন করে সব করতে হয়। তারপর খুশী গলায় বলল, "কি বাবু, গোছগাছ তো সব হল। এবার আপনি দয়া করে একটু ঘরটা আগলিয়ে বসুন। আমি যাই সমুদ্রের পাড়ে একটা চক্কর দিয়ে আসি। সত্যি কি ফাইন, না?"

নীলাঞ্জন শুকনো হাসি হেসে বলল, "আমার দেশলাই সব ফুরিয়ে গেছে। ফেরার সময় কোণের দোকান থেকে এক প্যাকেট সিগারেট আর এক বাক্স দেশলাই কিনে নিয়ে এস।"

শ্যামলী ঘাড় নেড়ে জানাল, ঠিক আছে। ওকে সিগারেট কিনে আনতে বলে নীলাঞ্জনের হঠাৎ নিজেকে কেমন বোকা-বোকা লাগে। শ্যামলী ঘাড় ফিরিয়ে তীক্ষ্ণ গলায় বলে, "আর দেখ, এই ফাঁকে তোমার বোতলে হাত দেবে না কিন্তু। আমার সব মাপ জানা আছে। যদি দেখি আবার গেলা হয়েছে, আমি কিন্তু বোতল ভেঙে ফেলব।"

নীলাঞ্জন বলল, "আরে না না, এমন কথা একেবারেই আমার মাথায় আসেনি।" একদম মিথ্যে কথা। সেই সকাল থেকে তার গলাটা শুকিয়ে আছে। ভাবছিল সামান্য একটু ভিজিয়ে নিলে মন্দ হয় না। কিন্তু সে জানে শ্যামলী এ ব্যাপারে নির্মম। বোতল এখন খুললে সে সত্যি সত্যি ভেঙে দেবে। সমস্ত ছুটিটাও মাটি হবে।

সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকে নীলাঞ্জন। বন্দী নীলাঞ্জন, স্বেচ্ছায় বন্দী।

পাঁচ বছর আগেও এ ধরনের বন্দিত্বের কথা ভাবলে সে শিউরে উঠত। আজ ভাবে, মন্দ কি? সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখে মধ্যাহ্নের নিস্তরঙ্গ রূপ। এই অখন্ড প্রশান্তির গভীরতা কে অস্বীকার করতে পারে? আজ তার জীবনও মধ্যাহ্নের কাছাকাছি এসে পেঁছেছে। ঐ দূরে সমুদ্রের বুকে যেমন জায়গায় জায়গায় সাদা ফেনা, তার চুলেও তেমনি এখানে সেখানে সাদা ছোপ। শ্যামলী প্রথমে পাকা চুলগুলো তুলে ফেলার চেষ্টা করত। সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সেও হার মেনেছে।

৪

(দেবারতির ডায়েরী থেকে)

আমার নাম দেবারতি চট্টোপাধ্যায়। বিয়ের আগে ছিলাম বন্দ্যোপাধ্যায়। ছোট বয়স থেকে সকলে আমাকে রতি বলেই ডাকে। আমার নাম থেকে দেবতার অঙ্গচ্ছেদন অবশ্য কারও ইচ্ছাকৃত কাজ নয়। আর রতি নামটা আমার জীবনের সঙ্গে কতটা সঙ্গতিপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে তা যারা আমার নাম সংক্ষিপ্ত করেন তাদের মাথায় নিশ্চয়ই আসে নি।

আজ কিছুদিন হল আমার বিয়ে হয়েছে। স্বামীর নাম বিমলেশ চট্টোপাধ্যায়। খুব ভাল ছেলে। মনটা ওর বড় নরম এবং স্বচ্ছ। আমার শরীর নিয়ে ওর পাগলামি আমার ভালই লাগে। মেয়েদের শরীরে যৌবনের ঢল একবার নামলে কিছু বয়স পর্যন্ত তাতে জীবনের বা চরিত্রের দাগ পড়ে না। অন্তত সরল মন অনভিজ্ঞ পুরুষের সে দাগ চোখে পড়ার কথা নয়। বিমলের আবার একটা নেশা আছে। ক্যামেরায় ছবি তোলা। তার মোটা মোটা অ্যালবামে অনেক ছবি। কিন্তু কোনটাতেই ওর বিয়ের আগে নারীদেহের তরঙ্গ বন্দী হয়নি। আজ তাই বোধ হয় আমার শরীরটা ওর ক্যামেরা দস্যুর মত গ্রাস করছে।

শরীর, শুধু শরীর। এ কথা আমাকে কেউ বলেনি। শরীরকে আমি পঁচিশ বছর পর্যন্ত ঢেকে রাখতে পেরেছি নিজের মর্জিমাফিক। দরকার মত ঢাকনা খুলেছি খুব কায়দা করে। ভেবেছি কেউ টেরটি পায়নি। সেই বার-তের বছর থেকেই কিন্তু আমি আমার শরীর বই কিছু জানি না। অন্য অনেক মেয়ের মত শুধু শরীরের সৌন্দর্য নিয়েই আমি ব্যস্ত নই। অবশ্য সকলের মত আমিও নিজেকে আয়নায় দেখেছি বারবার, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি আমার দেহরেখার রূপান্তর। কেমন সহসা সমতলভূমিতে ঢেউ খেলে গেল। কিন্তু তার থেকেও বড় জিনিস সে বয়স থেকেই আমি শুনতে পাই আমার দেহের দাবী। পুরুষের একটুকু ছোঁয়াতেই আমার রক্ত মাংস চামড়ায় একটা খুশীর জোয়ার আসে। মাঝে মাঝে সেই তীব্র অনুভূতিতে আমার সমস্ত শরীর আর্দ্র রোমাঞ্চে থরথর করে কাঁপতে থাকে।

আমি যখন ইস্কুলের শেষ ধাপে তখনই আমাদের ভাড়াটেদের একটা ছেলে আমাকে দেহের ভাষা পড়তে শেখায়। সে হাঁদারাম বোধহয় সারা জীবন বড়াই করে বেড়াচ্ছে আমি তার প্রথম শিকার। আসলে জাল ফেলেছিলাম আমি নিজেই—আর জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেছিলামও আমি। আসঙ্গের ক্লান্তিতে পাশের হাঁপিয়ে পড়া পুরুষটি যখন আত্মসুখে রোঁয়া ফুলে ওঠা বেড়ালের মত আমার

দিকে তাকায়, তখন আমার তার প্রতি অপরিসীম একটা বিতৃষ্ণা আসে। তখন সে আমার কাছে বিকল একটা যন্ত্র, যার প্রয়োজন ফুরিয়েছে। তবে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করতে আমার ভাল লাগে না। সুতো কাটার ধারাল অস্ত্র আমি পরিত্যক্ত পুরুষের হাতে নিজেই গছিয়ে দিই।

কলেজে কিছুদিন আমার খুব বন্ধু ছিল লতিকা বলে একটি মেয়ে। আমি জানি ন্যা কলেজ জীবনে ছেলেদের মধ্যে বন্ধুত্বের অন্তরঙ্গতা কতটা এগোয়। কিন্তু মেয়েরা খুব খোলামেলা কথা বলতে পারে। আমি একদিন লতিকাকে বললাম আমার পুরুষ দেহ সম্বন্ধে তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা। সে মুখ বাঁকাল। বলল, পুরুষদের সেও একেবারে দেখতে পারে না। আমি বললাম আমার সমস্যার কথা। পুরুষমানুষের কাছে গেলে আমার কেমন গা ছমছম করে। কেমন করে বাড়ীর একটা জোয়ান চাকর যখন গামছা গায়ে কলে দাঁড়িয়ে চান করত, আমি লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতাম আর আমার কানের লতি অসহ্য গরম হয়ে উঠত। এর মধ্যেই আমি তিনটি ছেলের সঙ্গে চূড়ান্ত প্রেম করেছি। কিন্তু শেষে তিনজনকেই অসহ্য মনে হয়েছে।

লতিকা একদিন আমাকে সন্ধ্যাবেলায় তার হস্টেলে যেতে বলল।

গিয়ে দেখি সে পর্দা ফেলে দিয়ে ঘরটাকে অন্ধকার করে রেখেছে। তার ঘরে অন্য যে মেয়েটি থাকে সে সিনেমায় গেছে। আমরা বসে চা আর ঝালমুড়ি খেলাম। এটা ওটা গল্প করলাম। লক্ষ্য করলাম লতিকা একটু একটু ঘামতে শুরু করেছে। কেমন চঞ্চল সে। হঠাৎ উঠে গিয়ে আলমারির ভেতর থেকে নিয়ে এল একটা বই—তাতে রঙীন ছবি অনেক। আমি দেখে তো একেবারে শিউরে উঠলাম। লতিকা বলল, "এই হচ্ছে আসল প্রেম। পুরুষের রুক্ষতার এতে স্থান নেই। তার অহমিকাও সহ্য করতে হয় না"। বলতে বলতে সে এগিয়ে এল আমার খুব কাছে। ঘন ঘন গরম নিঃশ্বাস লাগল আমার ঘাড়ে, গলায়। "রতি, তুমি কি সুন্দর"। আধো আধো গলায় বলতে লাগল লতিকা। আর ভেজা চুমোতে ভরিয়ে দিল আমার ঘাড়, গলা, চিবুক। আমি তাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। বললাম, "লতিকা, কি করছ এসব যা তা। আমার গা ঘিনঘিন করছে।" লতিকা খেঁকিয়ে উঠল, "সাধারণ, তা হলে তুইও সেই সাধারণ একটা মেয়ে। যা এখান থেকে।"—বলে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। আমি যেন সারা শরীরে কাদা ছিটিয়ে ওর ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

লতিকার কোন দোষ নেই। তার চোখে মেয়েরা দুজাতের। কেউ কেউ তার দলে, যারা ঐ ছবিগুলোর মত বিচিত্র সব নানা ভঙ্গিতে নিজেদের শরীরের আগুন নেবায়। আর যারা, সাধারণ মেয়ে। পুরুষের বাহুডোরে যারা করে অমৃতের সন্ধান। আমার মত মেয়ে ওর বুদ্ধির বাইরে।

আসলে আমার সমস্যাটা নেহাৎই আমার নিজস্ব। ঈশ্বর আমার প্রাণে প্রেম বলে কোন বস্তু দেননি। কিন্তু দেহে কামনা ষোল আনা। পুরুষ আমার চাই। কিন্তু আমার কাছে পুরুষের মূল্য কণামাত্রও নয়।

সতীত্ব গেছে আমার অল্প বয়সেই। তা নিয়ে আমার কোনদিন লজ্জা বোধ হয়নি। যেদিন বুঝলাম আমার শরীর যেমনি কাঙাল, আমার মন তেমনি পাথরের মত শক্ত—সেদিন থেকেই দেহের আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে আরও অনেক

আনুষঙ্গিক গুছিয়ে নেওয়া শুরু করলাম। আজকাল আমাদের দেশে কলগার্ল বলে এক ধরনের পালিশ করা বেশ্যার গতিবিধি শুরু হয়েছে। টেলিফোনে ক্রিং ক্রিং শব্দ—রিসিভারটা কানে তুলে বলা, আই অ্যাম এ্যাট ইয়োর সার্ভিস। একটা সিনেমার বিজ্ঞাপনে শহরের সবাই বেশ কিছুদিন আগে এই সব কুহকিনীর পরিচয় পেয়েছে। আমাকে কোনদিন সে রকম কলগার্ল হতে হয় নি। আই অ্যাম এ্যাট নো-বডিস সার্ভিস।

বি-এ-টা পাশ করার পর সহজেই একটা সদাগরী আপিসে রিসেপ্‌সনিস্টের কাজ জুটে গেল। তারপর যে সার্কিটে আমার যাতায়াত শুরু হল সেখানে পুরুষ বন্ধু জোটান হাতের পাঁচ। আজকাল ইনফ্লেশনের বাজারে সদাগরী আপিসে অনেক অল্প বয়সী বীরপুঙ্গবের আবির্ভাব হয়েছে যারা অভাবিত রকমের উঁচু মাইনে পায়। জীবনের ওই নির্ঝঞ্ঝাট সময়ে দামী সিগারেট আর মদ খাওয়া আর মেয়েদের নিয়ে ফুর্তি করায় তাদের অঢেল সুযোগ। আর তাতে আমার মত মেয়েদের পোয়াবারো। পুরুষ সম্বন্ধে আমার কোন বাছবিচার ছিল না। দেহের তৃপ্তির জন্য তাদের প্রয়োজন। আর তাদের ঐ ফুলে ফুলে উড়ে বেড়ানো বাহাদুরি আমার কাছে বিধাতার আশীর্বাদের মত। আমারও কোন বন্ধন আসে না। কোন মন দেওয়া-নেওয়ার অভিনয় কিংবা মন ভাঙাগড়ার বালাই নেই। শুধু একটা জিনিসে খুব হুঁশিয়ার থাকতে হত। যখন কোন পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে রাত কাটিয়েছি, সাক্ষী থাকতে দিইনি। বাবা মা মফস্বলের বাসিন্দা। যে সমাজে আমি বহু ভোগ্যা সে সমাজের কোন খবর তাঁদের কানে পেঁছোতো না। তাঁরা ভাবতেন মেয়ে আমাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দু পয়সা রোজগার করছে। আমার বিয়ে নিয়ে তাঁদের ভাবনার শেষ নেই।

একবার একটা ঘটনা ঘটেছিল যা আমার মনে আছে আজ পর্যন্ত। আর এমনই গ্রহের ফের যে আজ সমুদ্রতীরে স্বামীর আদরে ভাসতে ভাসতে ভয় হয় সেই ঘটনাটার ছায়া আবার আমার জীবনে এসে পড়েছে। কিছু একটা করতেই হবে। বিমলকে আমি অনথা কষ্ট দিতে চাই না। তাকে আমি ভালবাসি না। কাউকেই ভালবাসি না। কিন্তু ওর প্রতি আমার কেমন একটা মায়া পড়ে গেছে। তা ছাড়া বয়স বাড়ছে। আমার জীবনেও সিকিউরিটির প্রয়োজন আছে। কদিন ধরেই বুঝতে পারছিলাম মধুচক্রে আমার মধুর দাম পড়তে শুরু করেছে। বাবা মারা গেলেন। কাকা আর মা মিলে যখন এই বিয়ের ঠিকঠাক করলেন, ভাবলাম মন্দ কি? কপালে সিঁদুর পরলাম হাসিমুখে।

যাক যে ঘটনাটার কথা বলছিলাম। বছর চারেক আগের কথা। উত্তরবঙ্গের একটা জংলা জায়গায় বনদপ্তরের একটা বাংলোয় একটি রীতিমত নাটক হয়ে গেছল। দেবেশ বলে একটি ছেলের সঙ্গে তখন আমার বেশ দহরম-মহরম চলছে। দেবেশ বিলেত ফেরত। আমার অন্যান্য সঙ্গীদের চেয়ে বয়সে একটু বড়ই হবে। ওর রুচি আর আভিজাত্য চোখে পড়ে। সূক্ষ্ম অনুভূতির ছোঁয়া লাগার মত একটা মন বলে কিছু ছিল ওর ভেতরে। সোজা হোটেল ঘরে টেনে নিয়ে গিয়ে দুচার পেগ হুইস্কি গিলে বিছানায় জাপটাজাপটি এ সবে তার অভ্যেস ছিল না। তাই মাসখানেক দেখা শোনার পরও আমাদের কোন দৈহিক সম্পর্ক হয়নি। সত্যি কথা বলতে কি ওর কাছে গেলে, ওর ব্যক্তিত্বের প্রখরতায় আমি কেমন যেন

আড়ষ্ট হয়ে পড়তাম। ভরসা ছিল সে সম্পূর্ণ খোলা হাত-পা মানুষ। সে নিজেই আমাকে বলেছিল বন্ধন তার জন্যে নয়। আমি বিশ্বাস করেছিলাম। ভুল করিনি।

সেবার দেবেশের এক নাগাড়ে তিনদিন ছুটি জুটে গেল। সেই প্রস্তাব করল, "চল রতি, বাইরে কোথাও ঘুরে আসি। আমার পাখি শিকারের নেশা আছে। একটা ফরেস্ট বাংলোয় ঘর বুক করেছি। জানি তোমার কোন আপত্তি হবে না।"

আমি চোখ নাচিয়ে বললাম, "তা তো গেলাম। কিন্তু পরিচয় কি দেবে? মিসেস রায়।"

দেবেশ ঘাড় ঝাঁকিয়ে বলল, "ক্ষতি কী?"

বাংলোয় গিয়েই আমার আত্মাভিমানে একটা ধাক্কা লাগল। ঘরে জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে দেবেশ ঠান্ডা চোখে আমার দিকে চাইল। আমি তখন আসন্ন আশ্লেষের উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছি। দেবেশ তার বন্দুকটা নিয়ে বলল, "যাই, দেখি কিছু পাখি পাওয়া যায় কি না। ততক্ষণ তুমি একটা বইটই নিয়ে সময় কাটিয়ে দাও। একেবারে ডিনারের সময় দেখা হবে।"

রাত্রে দেবেশ যখন ফিরল, কেমন উদভ্রান্তের মত চেহারা। জামাকাপড় কাদায় মাখা। এসেই সে টেবিলে বসে পড়ল। বলল, "খুব খিদে পেয়েছে। এসো, খেয়ে নেওয়া যাক।"

খেতে খেতে আমি বললাম, "বাংলোতে আর একজন অতিথি এসেছে। কিন্তু একবারও ঘর থেকে বেরোয় নি। বোধহয় জোলো হাওয়ার ভয়ে।"

দেবেশ শুধু অন্যমনস্কের মত মাথা নাড়ল।

আমরা চুপচাপ খাচ্ছি এমন সময় সেই ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন তাঁর ঘর থেকে। বেশ বোঝা যাচ্ছে নেশায় টং। স্খলিত পায়ে এগিয়ে এসে বেয়ারার কাছে এক বোতল জল চাইলেন।

আমাদের দিকে একবারটি তাকিয়ে উনি আবার বেয়ারার সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। দেবেশের হঠাৎ ঘোর ভাঙল যেন। ওদিকে চোখ পড়ামাত্র চেঁচিয়ে উঠল, "আরে নীলাঞ্জন যে। ইট্জ্ এ স্মল ওয়ার্ল্ড।"

নীলাঞ্জন এগিয়ে এসে দেবেশের পিঠে হাত রাখল। তীক্ষ্ম চোখ দুটো তার নিরাসক্তভাবে আমার সমস্ত শরীর ছুঁয়ে গেল।

দেবেশ বলল, "আলাপ করিয়ে দিচ্ছি। আমার বিলেতের সতীর্থ নীলাঞ্জন গুপ্ত। আর এ হল দেবারতি ব্যানার্জি। আমার বান্ধবী। হ্যাভিং এ উইকএন্ড টুগেদার।"

নীলাঞ্জন শুধু একটু হাসল। হাসলে ওর মুখটা কেমন যেন বেঁকে যায়। চোখের চামড়াটা কুঁচকে যায়। বলল, "হ্যাভ এ গুড টাইম।" তারপর শ্লথ পদে নিজের ঘরে চলে গেল। আমরাও আমাদের ঘরে এলাম।

ঘরটা আমার প্রথম থেকেই পছন্দ হয়নি। এক পশলা বৃষ্টির পর আরও স্যাঁৎসেঁতে লাগছিল। ঘরে ঢুকেই দেবেশ আমাকে তার বলিষ্ঠ বাহুতে জড়িয়ে ধরে মুখে চুমু খেতে লাগল। কিন্তু কেমন যেন ছাড়া ছাড়া ভাব। আমার রক্তে আগুন জ্বলতে তবুও সময় লাগল না। বিছানায় টান টান হয়ে শুয়ে পড়লাম। কোমল আলোতে মেলে দিলাম আমার ঢেউ খেলানো যৌবন; সাদা, নিরাবরণ। দেবেশ মুগ্ধ হয়ে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর ফস করে একটা সিগারেট

ধরিয়ে জানালার দিকে সরে গেল।

"এসো, এসো, এক্ষুনি আমার কাছে এসো।" আমি একরকম কঁকিয়ে উঠলাম।

খানিকক্ষণ দেবেশ চুপ করে রইল। ওর দৃষ্টি জানালার বাইরের জমাট অন্ধকার ভেদ করার চেষ্টা করছে যেন। তারপর বিষণ্ণ গলায় বলল, "আমার সব কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে রতি। আজ আমার কেন জানি সবকিছু খুব বাজে লাগছে। দু দুটো ঘটনা ঘটল একই দিনে। পাখি শিকারে যখন বেরুই সঙ্গে ছিল এখানকার দরোয়ানটা। একটা পাখি আমার অব্যর্থ নিশানায় ঝুপ করে মাটিতে পড়ল। দরোয়ানটা বাহবা দিল। বলল, সাহেবের কি টিপ। তারপর খানিকটা এগিয়ে গিয়েছি। ফিরে তাকিয়ে দেখি দরোয়ানটা মরা পাখিটার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখ দিয়ে দরদর করে জল গড়িয়ে পড়ছে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। বাংলোয় ফিরে এসে নীলাঞ্জনের সঙ্গে দেখা। নেশায় চুর। আর একটা মাটিতে থুবড়ে পড়া পাখি দেখলাম যেন। তবে কেউ তার জন্য কাঁদে না বোধ হয়।"

নীলাঞ্জন গুপ্ত কি করে মুখ থুবড়ে পড়া পাখি হল তা জানার কোন কৌতূহল ছিল না সে রাতে। আমি বললাম, "রাত অনেক হয়েছে। আমি ঘুমিয়ে পড়ছি"। আলনা থেকে শাড়িটা টেনে শরীরে জড়িয়ে নিলাম। পরদিন সকালেই কলকাতা ফিরে এলাম। বৃথা গেল রজনী। শুধু সাক্ষী রইল নীলাঞ্জন গুপ্ত। আজ এই সাগরতীরের পান্থশালায় দোতলার একটা জানালায় ওকে দেখলাম। আমাকে নিশ্চয়ই চিনতে পেরেছে। দেবেশ বলেছিল নীলাঞ্জন পার্ফেক্ট জেণ্টেল-ম্যান। দেখা যাক কেমন ভদ্রলোক সে।

নীলাঞ্জন সিগারেট টানে আর ভাবে সেই মেয়েটির কথা। দেবারতি না কি যেন একটা নাম ছিল। বছর চারেক আগে ওকে দেবেশ রায়-এর সঙ্গে একটা জংলা বাংলোতে দেখেছিল—আজ আবার দেখল এই পান্থশালায়। একঘরে শুয়ে দেবেশ আর ঐ মেয়েটি সে রাতে কি করেছিল তা নিয়ে নীলাঞ্জনের কোন কৌতূহল নেই। কিন্তু উদ্দেশ্য কি ছিল তা তার অজানা নয়। আজ দেখছে মেয়েটি আর একটি ছেলের সঙ্গে হুটোপুটি করছে। কেমন আদুরে আদুরে মুখ করে চেয়ে থাকে ছেলেটির দিকে। শ্যামলী বলল ওরা নতুন বিয়ে করেছে। কে কাকে বিয়ে করল সে সম্বন্ধে নীলাঞ্জনের আদৌ উৎসাহ নেই, তবু ও মেয়েটিকে নিয়ে ভাবতে মজা লাগে।

আচ্ছা, ঐ ছেলেটি—নাম যার না কি বিমল—সে কি করবে, যদি সে জানতে পারে দেবেশের কথা, তার নববিবাহিতা স্ত্রীর পুরোনো বন্ধুর কথা। চিন্তায় হঠাৎ ছেদ পড়ল। তার কাঁধে হাত রাখলেন পাগড়ি মাথায় এক বলিষ্ঠ শিখ ভদ্রলোক। এক মুহূর্তের জন্য নীলাঞ্জনের সব কটা হাড় যেন মড়মড় করে উঠল।

"বিউটিফুল বীচ, নয় কি?" ভদ্রলোক বললেন।

নীলাঞ্জন গায়ে পড়া আলাপে বিরক্ত। তবুও ভদ্রতার খাতিরে মৃদুকণ্ঠে

সম্মতি জানায়। আড়চোখে ঘড়িটা দেখে নেয়। মোটে সন্ধ্যা ছটা। আটটার আগে বোতল নিয়ে বসলে শ্যামলী তুলকালাম ব্যাপার বাধাবে।

শিখ ভদ্রলোক নীলাঞ্জনের ঔদাসীন্য গায়ে মাখলেন না। পরিচয় দিলেন। নাম অর্জন সিং। নিবাস পাতিয়ালা। সম্প্রতি মেয়ে জামাইকে দেখতে বিলেতে গিয়েছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে জানালেন মণ্ট্রিয়লের বীচও তাঁর খুব ভাল লেগেছিল (আচ্ছা মণ্ট্রিয়ল কি সমুদ্রের পারে?—নীলাঞ্জন ঠিক মনে করতে পারে না।) অর্থাৎ ক্যানাডা দেশটাও ওর চেনা। পেশা জানা গেল না। নেশা বাঘ শিকার। একেবারেই নীলাঞ্জনের আওতার বাইরে ভদ্রলোক।

হঠাৎ আচ্ছা চলি বলে ভদ্রলোক গটগট করে নীচে নেমে গেলেন। নীলাঞ্জন সী বীচের দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। দেখেই তার আনন্দ। সমুদ্রে নামা তার হবে না। জল সম্বন্ধে ওর একটা আতঙ্ক আছে। শ্যামলী অবশ্য বলেছে প্রাণভরে চান করবে। একদিনেই একটি নুলিয়ার সঙ্গে বেশ জমিয়ে নিয়েছে।

আবার বারান্দায় অর্জন সিং-এর দীর্ঘ ছায়া। এবার একা নয়। সঙ্গে দুটি শেতাঙ্গিনী যুবতী। এলেমদার লোক বলতে হবে। নিজের ঘরের দিকেই যাচ্ছিলেন। হঠাৎ কি মনে হতে নীলাঞ্জনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কেয়ার ফর এ ড্রিংক?"

নীলাঞ্জনের অর্জন সিংকে সেই মুহূর্তে খুব ভালবাসতে ইচ্ছে হল। এরকমভাবে গ্রেফতার হতে ওর বেশ ভাল লাগে। সে হাসি মুখে বলে, "থ্যাংক্স্। আই উড লাভ ইট।" সিংজী ওকে ওর ঘর থেকে একটা গেলাস নিয়ে আসতে বললেন।

হুইস্কি পানের বিবিধ নিয়মকানুন পালন করার পর আলাপ। মেয়ে দুটো নিতান্তই অশিক্ষিত। পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছে টাকা আর সাদা চামড়ার দৌলতে। এই জাগ্রত ভূখণ্ডেও তারা উঁচু মহলের বাসিন্দা বলে সেলাম কুড়িয়ে নেয়। এই যেমন সিংজী বেছে বেছে ওদের দুজনকেই তাঁর ঘরে আপ্যায়ন করছেন। নীলাঞ্জন তো শুধু সংখ্যার সাম্য বজায় রাখার জন্যই নিমন্ত্রিত।

সিংজী মেয়ে দুটিকে জিজ্ঞেস করলেন, "শ্যাল আই গেট সাম ফুড ফর ইউ। হাউ এব্যাউট এ ফিশ ফ্রাই?"

মেয়ে দুটির চোখে গভীর বিস্ময়। "ফিশফ্রাই, হোয়াট্স্ দ্যাট?"

নীলাঞ্জন মুখ খোলে। বুঝিয়ে দেয় ফ্রায়েড ফিশের কথা হচ্ছে। সে নিজে কিছুতেই বুঝতে পারে না ইংরেজী ভাষায় এই সামান্য তারতম্যে ইংরেজীভাষীরা এমন বিপন্ন বোধ করে কেন।

এক পেগ খাওয়ার পরই নীলাঞ্জনের বাজে লাগতে লাগে। সে উঠে এল। শ্যামলী একা ঘরে আছে। তা ছাড়া সিংজীর সঙ্গে মেয়ে দুটোকে নিয়ে কাড়াকাড়ি করার তার ইচ্ছে ছিল না একটুও।

পরদিন দুপুরে সিংজী আবার ডাক পাঠালেন। এবার নীলাঞ্জন আর শ্যামলী দুজনকেই। বের করলেন হুইস্কী আর জিন। সমুদ্রের প্রসারতা আজ যেন শ্যামলীর হৃদয়েও খানিকটা প্রসারতা এনেছে। বহুদিন পর নীলাঞ্জন সিরিয়াস ড্রিংকিং-এর সম্ভাবনা দেখতে পেল। সিংজী যুগ যুগ জীও বলে সে আসরে

নামল।

সিংজীর মত মানুষ কথার ভেতর দিয়েই আত্মপ্রকাশ করেন। ওঁর অন্তরের অন্তঃস্থলে পেঁছতে হলে দক্ষ ডুবুরী হবার দরকার নেই। ভদ্রলোক মদ ভালবাসেন। মদ খুলে দেয় কথার ফোয়ারা। নিঃসঙ্গতাকে ওঁর বেজায় ভয়। একটু যা নিজের সম্বন্ধে গল্প করতে ভালবাসেন। সামনে গেলাস ভরতি তরল আগুন থাকলে নীলাঞ্জন আদর্শ শ্রোতা হতে পারে। আর এই নির্বান্ধবপুরীতে ওর কথা শুনতে খুব খারাপ লাগে না তার। পাঞ্জাবকেশরীর বিক্রম একটু আতিশয্য-দোষে দুষ্ট। কিন্তু লোকটাকে ঝট করে মিথ্যেবাদী বলতে নীলাঞ্জনের মন চায় না।

"মিসেস গুপ্ত, বলুন তো আমার বয়স কত?"

"এই পঞ্চান্ন হবে।"

"এই বছর আমি উনসত্তরে পড়লাম।"

"তাই বুঝি। দেখলে কিন্তু মনে হয় না।"

"আচ্ছা আপনি এই সোডা বোতলের ছিপিটা হাত দিয়ে বাঁকা করতে পারেন?"

শ্যামলী প্রশ্নটার উদ্দেশ্য না বুঝে খিলখিল করে হাসে।

"এই দেখুন, আমি কেমন দুটো ছিপিই এক হাতে চ্যাপটা করে দিচ্ছি।" যেই কথা সেই কাজ। আমি এই সেদিনও আঙুল দিয়ে ওগুলো ছিঁড়তে পারতাম", সিংজী আস্ফালন করেন।

গল্পের পর গল্প। অবশ্য সব গল্পেরই নায়ক সিংজী স্বয়ং। একবার উনি নাকি পার্ক স্ট্রীটের একটা দোকানে কি একটা ওষুধ কিনতে গিয়েছিলেন। অন্যমনস্ক ছিলেন। হঠাৎ একটা কাঁচের পার্টিশন ভেদ করে হেঁটে চলে গেলেন তিনি। রক্তে রক্তাক্ত শরীর। কোন ট্যাক্সি তাঁকে নিতে চায় না। শেষে এল এক সর্দারজীর ট্যাক্সি। তখন আবার আর এক কাণ্ড। ট্যাক্সিচালক কৃপাণ বের করে চেঁচিয়ে উঠল দেখি কোন্ দুষমন আপনার এ হাল করেছে। অর্জন সিং বুঝিয়ে বললেন একটা অ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছে মাত্র। অনুরোধ করলেন তাঁকে একটা হাস-পাতালে নিয়ে যেতে। সর্দারজী তার সওয়ারীদের নেমে যেতে বলল। বেচারীরা কৃপাণটিপান দেখে এর মধ্যেই জোর ঘাবড়ে গেছে। সুড়সুড় করে কেটে পড়ল। হাসপাতালে আসা গেল। সেখানে আবার ক্লোরোফর্ম নেই। কি করা যায়? অর্জন সিং ডাক্তারকে বললেন, "ঘাবড়াও মৎ। এমনি যা করার কর।" দেড় ঘণ্টা ধরে ওঁর ওপর শল্য চালনা হল। তারপর সিংজী সোজা ট্রেনে করে চলে গেলেন আসানসোল। সন্ধ্যাবেলায় হুইস্কি নিয়ে বসলেন।

শ্যামলী অভিভূত। বলল, "আপনাদের শিখদের মধ্যে খুব ইউনিটি।" অর্জন সিং বলে "আমরা সবার জন্যই জান দিতে পারি মিসেস গুপ্ত। এই তো কিছুদিন আগের একটা ঘটনা। গৌহাটি থেকে গাড়ি চালিয়ে শিলং যাচ্ছি। পথে দেখি একটা গাড়ীতে একটি ফুটফুটে খাসিয়া মেয়ে দারুণ জখম হয়ে পড়ে রয়েছে। গুরুতর অ্যাকসিডেণ্ট। পথচারীরা দেখেও দেখছে না। আমি মেয়েটিকে নিজের গাড়ীতে তুললাম। সেখান থেকে সোজা গৌহাটি হাসপাতাল। হাসপাতালে আবার নিয়মকানুনের শেষ নেই। ডাক্তার বললেন, মেয়েটি তোমার কে হয়? আমি তো মেয়েটার নামও জানি না। তখন বললাম, আমার বউ। তারপর কয়েক ঘণ্টা

জীবন মৃত্যু নিয়ে যুদ্ধ। হাসপাতালের কর্মচারীরা সবাই দুর্বল। রক্ত দেবে কে? আমিই দিলাম তিন বোতল রক্ত। মেয়েটি বাঁচল। তার পরিবারও খুঁজে পাওয়া গেল শেষ পর্যন্ত।"

অর্জন সিং-এর গল্পের আর শেষ নেই। হঠাৎ জিজ্ঞেস করল নীলাঞ্জনকে, "তুমি কোথায় কাজ কর?"

এ ধরনের আলোচনা নীলাঞ্জনের রুচিবিরোধী। তবুও বলে, সে একটা খবরের কাগজে লেখার কাজ করে।

সিংজীর পরের প্রশ্নটা আরও বিরক্তিকর। অনেকেই করে ঐ অভদ্র প্রশ্ন। "তোমার কত ইনকাম হয়?"

নীলাঞ্জনের গেলাসের অমৃত বিস্বাদ লাগে। তবুও তার আয়ের পরিমাণটা বলে ফেলে।

সিংজী বলেন, "মোটে। কি করে চলে তোমার?"

এবার নীলাঞ্জনের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। একটু রেগে গিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করে, "আপনি কি করেন? কন্ট্র্যাক্টরি? না কি ট্রান্স্পোর্ট বিজনেস আপনার?"

অর্জন সিং-এর মুখ বিষণ্ণ হয়। বলে, "না ভাইসাহেব। আমার আজ কিছুই আয় নেই বলা চলে। পার্টিশনে সম্পত্তি গেল। প্রিভি পার্সে বছরে ষোল লাখ টাকা আসত, মোটামুটি স্টাইল বজায় রাখা যেত। এখন তো তাও গেছে।"

নীলাঞ্জন এবার নতুন চোখে তাকায় লোকটির দিকে। ধাপ্পাবাজ না কোন হৃতগৌরব রাজা মহারাজা। ষোল লাখ টাকা বছরে! ভাবতেও কেমন রক্ত চনচন করে। জিজ্ঞেস করল, "আপনার নামের আগে খেতাবটা ছিল কী?"

সিংজী বললেন, "আমার নাম ছিল কুমার সাহেব অর্জন সিং।" নীলাঞ্জনের কৌতূহল বেড়ে যায়।

হঠাৎ অর্জন শ্যামলীকে বলল, "জানেন। আমার পাকিস্তানেও অনেক সম্পত্তি ছিল। দিয়ে দিয়েছি। ওখানকার একটি মেয়েকে। আমার সুইটহার্ট। ওখানে আমার দুটো লেড়কা আছে। অবৈধ সন্তান। ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত ওরা আমাকে চিঠি লিখত।"

সিংজীর চোখ নেশায় আর ঘুমে বুজে আসে। নীলাঞ্জন তার গেলাশটি টেবিলে নামিয়ে রেখে উঠে পড়ে। আঁধারে বিলীন হয় সমুদ্রতীর।

৫

কালো মেয়ে লছমি। কতদিন ধরে চোখে ছিল তার সোনালী স্বপ্ন। সেই পাঁচ বছর আগে প্রথম দেখে তার মনের মানুষকে—সোনালী চুল, নীল চোখ। বাবা নিয়ে এসেছিল বাড়ীতে। লছমির বাবা সর্দার নুলিয়া। দক্ষিণ ভারত থেকে ছোট্ট মেয়েকে বুকে করে এই সমুদ্র শহরে চলে আসে বিস্মৃত অতীতে—যে বছর লছমির মা বিনা নোটিশে তাদের ছেড়ে চলে গেল। বছর পাঁচেক আগে সুইডেন থেকে এসেছিল তরুণ ইগর। নেশা তার ঝিনুক কুড়োনো। সমুদ্রস্নানের ফাঁকে ফাঁকে সর্দার নুলিয়ার সঙ্গে তার জমাট আড্ডা হত। একদিন দুজনে মিলে দিশী মদের নেশা করল। কাঁকড়ার ঝাল খেল। সর্দার নুলিয়া ইগরকে বাড়ী নিয়ে গেল, আলাপ করিয়ে দিল মেয়ের সঙ্গে।

লছমির তখন কি বা বয়স। তেরো চোদ্দ। ইগরকে ওর ভাল লাগল। সমুদ্র-তীরে ইগর যখন ঝিনুক কুড়োত, লছমি ওর পেছন পেছন ছায়ার মত লেগে থাকত। কদিনেই ইগর ওদের ভাষা মোটামুটি রপ্ত করে নিল। সে বছর যাবার সময় ইগর সর্দার নুলিয়াকে বলল, এর পর এসে ওদের বাড়ীতেই সে থাকবে। ওরা বিশ্বাস করল না। লছমিকে ইগর একটা পুঁথির মালা দিয়ে গেল। কিশোরী লছমি সেটাকে আগলে রাখল সযত্নে।

পরের বছর ওরা তো অবাক। মালপত্তর নিয়ে ইগর একদম সোজা ওদের বাড়ীতে হাজির। শুধু বলল, এসে গেলাম।

এর মধ্যে লছমির শরীরে এসেছে ভরা যৌবন। চোখে এসেছে স্বপ্ন দেখার নেশা। এবার ইগর-এর সঙ্গে গল্প করতে তার কেমন লজ্জা লজ্জা করত। ইগরও মাঝে মাঝে তার দিকে কেমন যেন অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত।

একদিন ইগর লছমির বাবাকে বলল, "আমি ফি বছর তোমার বাড়ী এসে থাকব। পয়সা দেব না কিন্তু। শুধু তোমার বাড়ীতে আমি ইলেকট্রিক লাইট আনার ব্যবস্থা করব, বাথরুমটার চেহারা বদলে দেব।"

নুলিয়া সর্দার বললে, "কিছু দরকার নেই। অতিথি, অতিথি।"

ইগর শুনল না। শীগ্গিরই লছমিদের বাড়ীর ভোল পালটাল। অন্য নুলিয়া আর জেলেদের চোখ টাটাল। জেলেদের ছেলে গোপাল। লছমির নবীন যৌবনে এর মধ্যেই ওর চোখে নেশা ধরেছে। বুক ভেঙে গেল গোপালের, ঈগলের মত ইগর এসে লছমিকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল বলে।

পরের বছর ইগর আবার এল। এবার বাবা মেয়ে তেমন অবাক হল না। লছমির মনে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে। ইগর কিন্তু এবার কেমন যেন আনমনা।

ঝিনুক কুড়োতে কুড়োতে আকাশের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থাকে। আবার কখনও তার নীল চোখ আদর করে লছমির শরীরের চড়াই উৎরাই।

একদিন সকালের সূর্য মধ্যগগনের দিকে এগোচ্ছে। ইগর হঠাৎ ঘরে ফিরে এল। লছমির বাবা কাজে বেরিয়েছে। লছমি অলস দেহে শুয়ে ছিল। ইগর একটাও কথা বলল না। ইশারায় ওকে শুয়ে থাকতে বলল। জামাটা খুলে ফেলল। তার পর মুখটা পাথরের মত শক্ত করে লছমিকে সাপটে ধরল।

লছমি ছটফট করতে লাগল। সংস্কার আর লজ্জা ক্ষণিকের বাধা। মনের বাঁধ কিন্তু এক নিমেষে ভেসে গেছে। ইগর-এর ঠোঁটের আগুনে ওর মুখ পুড়ে যাচ্ছে। লছমির স্তন দুটো থেকে কাপড় সরে গেছে। সেখানে ইগর-এর রোমশ হাত দুটো চঞ্চল। লছমির শরীরে বিদ্যুৎ। দুজনের মুখে কোন কথা নেই। শুধু শরীরে শরীরে কানাকানি। তারপর যা হবার তাই হল। ইগরের কামনার উত্তেজনায় লছমির লজ্জার শেষ অবরোধ ভেঙে গেল।

একবার নেশায় ধরলে আর নিজেকে ধরে রাখা যায় না। লছমির কালোশরীর ইগরের প্রচণ্ড আবেগে রাত্রিদিন দুলতে লাগল, ঝড়ের মুখে নৌকোর মত। ইগর লছমিকে উলটে পালটে দেখতে চায়। বলে, "কি হবে মন্দিরগাত্রের ভাস্কর্য দেখে। তোমার শরীরেই সব সৌন্দর্য, সব লীলা।" লছমিকেও পেয়েছে আবিষ্কারের নেশা। গোরা অঙ্গে এত রূপ।

তারপর একদিন ইগর চলে গেল। লছমি কাঁদে। কাঁদে সারা অঙ্গ। নীলখামে চিঠি এল। ইগর স্বদেশিনী কোন রঙ্গিনীকে বিয়ে করেছে। লছমিকে সে কোনদিন ভুলবে না। সম্পর্ক ঝেড়ে মুছে ফেলার চিরাচরিত ভাষা।

এবার কিন্তু লছমির চোখ শুকনো। কান্না নেই। শুধু স্মৃতি। সারাদিন সে সমুদ্রতীরে ঘুরে বেড়ায়। পূর্ণিমার রাতে, অমাবস্যার রাতে বসে থাকে ঝাউবনের অন্ধকারে। লোকে হাসে। যারা তার দুঃখের কাহিনী জানে—ঠাট্টা করে, বলে সাদা চামড়ার লোভে মেয়েটার এই দশা। কেউ আবার সর্দার নুলিয়াকে দোষ দেয়। বলে, বাড়ীঘরে জৌলুস আনতে গিয়ে মেয়েটার ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে দিয়েছে সে। লছমি কারুর কথায় কান দেয় না। সর্দারের বুক ফেটে দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে আসে। সে তো কিছুই জানত না। ইগর ছেলেটাকে তার ভাল লেগেছিল। ওকে সে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেছিল। কে জানত এমনটা হবে?

ইগর-এর বেইমানিতে খুশী হয়েছিল এক জেলেদের ছেলে গোপাল। লছমির মনের আকাশে ঐ গৌরাঙ্গ যতদিন সূর্যের মত জ্বলজ্বল করত, ততদিন সেখানে ছোটখাটো নক্ষত্রের কোন জায়গা ছিল না। ইগর চলে গেলে গোপাল স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছিল। এবার বোধহয় লছমি তার দিকে ফিরে তাকাবে। অন্য দশ-জনের মত সেও শুনেছে লছমির কেলেঙ্কারির কথা। মন খারাপ হয়েছে। কিন্তু দোষ দেয় সে ঐ হৃদয়হীন শ্বেতাঙ্গ পুরুষটাকে। লছমি ছেলেমানুষ বেচারী কি করছিল নিজেই জানত না। আসলে ছেলেমানুষ গোপাল। সে জানে না মেয়েদের ইচ্ছে না থাকলে তাদের শরীর সহজে বে-আব্রু হয় না। গোপালের মনে কিন্তু সুখ নেই। লছমিটা কেমন যেন হয়ে গেছে। গোপাল তার কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করে। মাছ ধরতে না গিয়ে সাগরপারে লছমির পেছন পেছন ঘুরে বেড়ায়। লছমি তাকে কিছু বলে না। কাছে গেলে মাঝে মাঝে তার ঠাণ্ডা কালো চোখ মেলে

ধরে গোপালের মুখের ওপর। ভাবলেশহীন মুখে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে তারপর ঘাড় দুলিয়ে চলে যায়। গোপালের চোখ ভালবাসায় এমনিতেই নরম মাঝে মাঝে চড়া রোদেও কেমন ভিজে ভিজে হয়ে যায়। আবার কখনও কখনও ওর মন বিদ্রোহ করে। দেখিয়ে দিতে ইচ্ছে করে ইগর-এর থেকে সে কোন মতে খাটো না। তারও শক্ত মজবুত দেহ। হতে পারে কালো, কিন্তু লছমিও তো কালো!

এবার যেন একটা সুযোগ হাতে এসে গেছে। এবার সে লছমিকে দেখিয়ে দেবে। ভারী তো একটা সাদা ছেলে ওকে কাছে টেনে নিয়েছিল। তার দিকেও কেমন লোভী লোভী চোখে চেয়ে থাকে ঐ সাদা মেয়ে দুটো। গোপাল-এর হাত দুটো নিশপিশ করে।

(নীলাঞ্জন ঃ স্মৃতিচারণ)

সিংজী ওরফে কুমারসাহেবের সঙ্গে মদ্যপানটা আজ একটু বেশী হয়ে গেছে। বারান্দায় একা একটা চেয়ারে বসে আছে নীলাঞ্জন। সবাই ঘুমিয়ে, সব নিস্তব্ধ। শুধু শোনা যায় সমুদ্রের গর্জন আর বাতাসের শব্দ। নীলাঞ্জনের চোখে ঘুম আসে না। আজ তার স্মৃতিচারণের পালা। দেখতে দেখতে কত বছর কেটে গেল। দশ, কুড়ি, তিরিশ, চল্লিশ বছর পুরো হল বলে। পুরোনো সব দিনের কথা সেই সেদিন মনে হয়।

ছোটবেলার কথা মনে আসে কেমন ছাড়া ছাড়া বিশৃঙ্খলভাবে। সেই বৃদ্ধবট। যার থেকে নেমে এসেছিল অসংখ্য ঝুরি মফস্বল শহরের জেলা অফিসারের কুঠিবাড়ীর বিস্তীর্ণ কম্পাউণ্ডের এক কোণে। আর এক কোণে অব্যবহৃত বাবুর্চি-খানা। মাকড়শার জালে ঢাকা। বাচ্চা নীলাঞ্জনের কাছে মনে হত রহস্যপুরী। নদীর পারে স্টিমারঘাট। সেখানে হঠাৎ শোনা যায় চিৎকার—হাফিজ, রশি টানো। নীলাঞ্জন দিন গুনতো বাবা আবার কবে বদলী হবে। সে আবার স্টিমারে চাপবে। ফ্লোরিক্যান নামটা এখনও মনে আছে। ডাইনিং সেলুনে টাঙানো সব বিলিতী ছবি। মুরগীর মাংসের ঝোল। মার জন্য নিরিমিষ খাবার।

স্কুলে গেলে শুনত সব চাপা উড়ো খবর। ইংরেজের সঙ্গে লড়াই চলছে স্বদেশীদের। আবার হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে লেগে গেছে প্রচণ্ড দাঙ্গাহাঙ্গামা। কলকাতায়, ঢাকায়, আরও অনেক জায়গায়। তাদের মুসলমান-প্রধান মফস্বল শহরেও আঁচ এসে লেগেছে। ওদের কুঠিবাড়ীতে পুলিশ মোতায়েন হল। ম্যাজি-স্ট্রেট সাহেব ছিলেন মুসলমান। বাবা-মার সঙ্গে এসে গল্প করতেন, প্রাণখোলা হাসি হাসতেন। তারপর একদিন এল সেই, সেই সে শুভক্ষণ। পনেরই আগস্ট, ১৯৪৭।

সেদিন সকালে নীলাঞ্জন দেখেছিল বাবার মুখ থমথম করছে। শুধু আর একদিন বাবার এমন জলদগম্ভীর রূপ দেখেছিল সে। এক বছর পর গান্ধীজী যেদিন দেশবাসীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করলেন আত্মাহুতি দিয়ে। পনেরই আগস্ট সকাল নটার মধ্যেই বাবাকে চানটান করে ধরাচুড়ো পরে বাড়ীর ছাতে যেতে হল। নীলাঞ্জনও সঙ্গে সঙ্গে গেল। আরও কারা সব যেন এসেছিল। পতাকা উড়ল বাতাসে পত্‌পত্‌ করে। সবুজ পতাকা মাঝখানে চাঁদ-তারা আঁকা। সবাই গর্জে উঠল, পাকিস্তান জিন্দাবাদ। বাবা কি বললেন শোনা গেল না। কোনদিন নীলাঞ্জন বাবাকে সে কথা জিজ্ঞেস করতে সাহস পায় নি।

পরে অবশ্য সে বাবার সেদিনের মনের ব্যথা খানিকটা বুঝতে পেরেছিল। সেদিন শুধু পাকিস্তানের পতাকা উত্তোলনের আশাভঙ্গই তাঁর মনে বাজেনি। নিজের ভিটেবাড়ীর সঙ্গে তাঁর সব সম্পর্ক শেষ হয়ে গেল সেদিন।

তারপর কলকাতায় পালান। সেই সব উৎকণ্ঠার দিন, আশংকার দিন, উত্তেজনার দিন, আশার দিন। দিনের বেলায় তাদের সেই নদীবেষ্টিত শহর থমথম করত। রাতে মানুষের আর্তনাদ, মশালের শিখার ঘনঘন উল্লম্ফন, অন্ধকার বিদীর্ণ হত আল্লা হো আকবর ধ্বনিতে। হায় রে ইতিহাস, হায় রে রাজনীতি। আল্লা আর আকবর দুটো এত গৌরবোজ্জ্বল নাম হঠাৎ কেমন করে বিভীষিকাময় দুটো ধ্বনি হয়ে গেল। পূর্ব বাংলা নীলাঞ্জনদের দেশ। কিন্তু পশ্চিম বাংলায় যাবার জন্য কি অধীর প্রতীক্ষা। অবশেষে যাওয়া হল। এবার আর ফ্লোরিক্যানের সুদৃশ্য ক্যাবিনে নয়, মেল স্টিমারের গুমোট গহ্বরে। ধীরে ধীরে চলে এই জাহাজ, দাঁড়ায় ছোট ছোট ঘাটে। কত লোক আসে, কত লোক নামে। ওদের মনে শুধু এক চিন্তা কখন সীমানার অপর পারে পেঁছানো যাবে।

নদীর শেষে খুলনা শহর। এমন এক সময় ছিল যখন তিনদিকে টলটল জলে ঘেরা এ শহরটি তার কমনীয় শ্রী নিয়ে যাত্রীদের চোখ আটকে রাখত। ঘাটের পাশে ছোট ছোট হোটেল। সেখানে গরম গরম ভাত, কলাপাতায় সাদা মাখন আর মাখনের মত ইলিশ মাছের ঝোল খাবার লোভে কত লোক স্টিমার ফেল করত। লোক মুখে শোনা যায় এখানকার নদীতীরের গরম বালুতে মাছ সেদ্ধ হয়ে যেত। আর তা মুখে দিলে সে কি অপূর্ব স্বাদ, মিষ্টি যেন গুড়।—এবার কিন্তু নীলাঞ্জনদের ওদিকে চোখ নেই। দৌড়োদৌড়ি করে ট্রেনে ওঠা। ফার্স্ট ক্লাশ রিজার্ভ করা আছে। কিন্তু কে কার কথা শোনে! ট্রেন ভর্তি লোক। পাদানে, ছাদে লোকে লোকারণ্য। এত লোক এলোই বা কোথা থেকে? যাচ্ছেই বা কোথায়?

বালক নীলাঞ্জনের চোখের সব কৌতূহল সেদিন ভয়ে উবে গেছে। সে শুনেছে দাঙ্গার তান্ডবলীলার কথা। শুনেছে খুলনা জেলাটা প্রথমে তাদের ভারতবর্ষের ভাগেই পড়েছিল। র‍্যাডক্লিফ সাহেবের বিধানে ওটা পাকিস্তানের হাতে চলে এসেছে। তাই পাকিস্তান প্রেমিকদের এই প্রচন্ড উল্লাস।

তাড়াহুড়োয় মা আর এবার তাঁর বিখ্যাত কই মাছের তেল-সর্ষে আর লুচি আলুর দম আনতে পারেন নি। রাত দশটা এগারটা হল। খিদেয় নীলাঞ্জনের পেট চো চো করছে। ওদের সঙ্গে ছিল এক পুরাতন ভৃত্য। সে আর নীলুভাই-এর অবস্থা দেখে বসে থাকতে পারল না। সেদিন রাতে জগন্নাথদার কীর্তিকলাপ আজকের দিনের পাব্লিক রিলেশনস্‌কে অনেক মাইল পেছনে ফেলে রাখতে পারে। কিছুক্ষণ পর সে সত্যি সত্যি একটু দই-চিড়ে জোগাড় করে নিয়ে এল। খানিকটা পেটে পড়ামাত্র অবশের মত এলিয়ে পড়ল নীলাঞ্জনের সারা শরীর।

তারপর হঠাৎ চোখ খোলামাত্র দেখল সারা আকাশ লালে লাল। সূর্য উঠছে। আর ট্রেন প্রবেশ করছে পশ্চিম বাংলায়। বেরুবাড়ি পেছনে পড়ে রইল। ভোরবেলার এত সৌন্দর্য নীলাঞ্জন তার দশ-বারো বছরের জীবনে আর কোনদিন দেখেনি।

কলকাতায় এসে প্রথম যা দেখে নীলাঞ্জন হাঁ হয়ে গিয়েছিল তা হল সারি সারি ট্রামগাড়ী। গাড়ীগুলোর গায়ে কি সব যেন লেখা—কি সব ছবি আঁকা—আর

সেগুলো কেমন ট্রেনের মত লাইন বরাবর চলে। ধীরে ধীরে আরও কত নতুন জিনিস আবিষ্কার করল সে। মেট্রোতে জীবনের প্রথম ইংরেজী ছবি দেখল। নামটা আজও মনে পড়ে—সিন্থিয়া। কেমন সুন্দর ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হলের ভেতরটা। পুরু কার্পেটে পা দিলে পা ডুবে যায়। দোরগোড়ায় ইয়া লম্বা একজন লোক ঝকঝকে পোষাক পরা। তারপর একদিন কফি হাউসে জীবনের প্রথম স্যাণ্ডউইচ খেল। ম্যাট্রিক পরীক্ষা যেদিন শেষ হল, খেল জীবনের প্রথম ফলমেশানো আইস-ক্রীম। কি আশ্চর্য একটা নাম—টুটি ফ্রুটি। আর একদিন দাদার সঙ্গে ক্যাসানোভা বলে একটা বড় রেস্টুরেন্টে লাঞ্চ খেল। মালিগ্যাটনি সুপ। কেমন ঝাল ঝাল টক টক মুসুরির ডালের মত। কাঁটা চামচের কি বাহার।

অবশেষে নীলাঞ্জনও সাবালক হল। প্রেসিডেন্সি কলেজ। চার চারটে বছর হৈ হৈ করে এল আর চলে গেল। প্রক্সি দিয়ে ক্লাশ পালান, আড্ডা, বিড়িফোঁকা। মার্কস, লেনিন, মাও সে তুং। কলেজ ম্যাগাজিন। থার্ড ইয়ার ক্লাশে এক ঝাঁক মেয়ে। উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা। চুমকি বসান ব্লাউজ গায়ে কামনার ঘন ঘন খসে পড়া আঁচলের ফাঁকে যুগলস্বর্গের ইসারা। রুপালি পর্দায় তখন চলছে সুচিত্রা-উত্তমের অগ্নিপরীক্ষা। বিশ বছর আগে।

আর ছিল সীতা। সীতাকে নীলাঞ্জন প্রথম দেখে অনেক বছর আগে। কিন্তু আবিষ্কার করে সেই পঞ্চাশের গোড়ার দিকে। সীতারাও নতুন ইহুদি—৪৭-এর ভারত ভেঙে ভাগ করার খেলায় ভিটেমাটি থেকে ছিটকে পড়েছে। নীলাঞ্জনের বাবা ছিলেন উচ্চপদস্থ সরকারী চাকুরে। তাই পার্টিশনের ধকলটা ওদের পরি-বারকে তেমন সইতে হয়নি। সীতার বাবা ছিলেন পূর্ববঙ্গের এক মফস্বল ইস্কুলের ইংরেজীর মাস্টার। ওরা বেশ একটু ধাক্কা খেয়েছিল।

সীতার বাবা ধনপতিবাবু নীলাঞ্জনের প্রাইভেট টিউটর ছিলেন। তিনি আবার ছিলেন ইস্কুলের স্কাউট মাস্টার। একটা ফ্ল্যাগ নিয়ে ছেলেদের অনেক কসরৎ শেখাতেন বলে ইস্কুলের দুষ্টু ছেলেরা ওর নাম দিয়েছিল ধ্বজা। ধ্বজা কথাটার যে একটা অসভ্য মানে হতে পারে—যা ধনপতিবাবুর নামের সঙ্গে আপত্তিকরভাবে অসমঞ্জস—নীলাঞ্জনের সেই বয়সে তা জানা ছিল না।

একবার একটা ঘটনা ঘটেছিল, নীলাঞ্জনের আজও মনে পড়ে। নিজের পক্ষে গ্লানিকর একটা ঘটনা। তার খাতায় অজান্তে সে ধ্বজা কথাটা অনেক জায়গায় লিখে ফেলেছিল। ধনপতিবাবু একদিন ওকে পড়াতে এসে দেখে ফেললেন। রেগে টং। বললেন, "কে লিখেছে এসব? বল, এক্ষুনি বল।" নীলাঞ্জন ভয়েই অস্থির। বলে দিল সুধাময়ের নাম। মিথ্যে কথা বলল। সুধাময় তাকে ধ্বজা কথাটা শিখিয়েছিল। কিন্তু খাতায় লিখেছিল সে নিজেই। ধনপতিবাবুর সেদিন ছিল ফার্স্ট পীরিয়ড। তিনি ঢুকলেনই বেত হাতে। সুধাময়কে ডেকে নিয়ে সে কী মার। সুধাময়টা পড়ে পড়ে মার খেল শুধু। নীলাঞ্জনের দিকে কেমন তাকিয়ে রইল—চোখে খানিকটা ঘৃণা, খানিকটা বিস্ময়। সুধাময় এ ঘটনার পর নীলাঞ্জনের সঙ্গে কোনদিন কথা বলেনি। কিন্তু নীলাঞ্জনের তাকেই মনে আছে।

ঐ মফস্বল শহর থেকে চলে আসার ঠিক আগে নীলাঞ্জন একবার ধনপতি-বাবুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। ধনপতিবাবু গোধূলি লগ্নে জানালা দিয়ে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন। নীলাঞ্জন তাঁকে প্রণাম করলে তিনি বললেন,

"যাচ্ছ। আমরাও যাব। সবাইকেই যেতে হবে।" নিজের হাতে অনেক দিন ধরে তিনি একটা কাঁঠাল গাছ বড় করেছিলেন। বললেন, "ওটা কিন্তু যেতে পারবে না। ওর শেকর খুব শক্ত।" তারপর হাঁক দিলেন, সীতা, সীতা। একটি ফ্রক পরা ছোট্ট মেয়ে এক প্লেট মিষ্টি আর এক গ্লাস জল নিয়ে ঘরে ঢুকল। ঢুপ করে নীলাঞ্জনকে একটা প্রণাম ঠুকে বলল, "আমি আপনাকে চিনি। আপনাকে প্রাইজ নিতে দেখেছি সেদিন বাবার ইস্কুলে।" নীলাঞ্জন শুধু হেসেছিল।

বহু বছর পর। সেদিন কলেজ যাবার পথে হঠাৎ কি মনে হতে নীলাঞ্জন ট্রাম থেকে নেমে পড়েছিল ভবানীপুরের ওদিকটায়। রাস্তায় চলতে চলতে দেখে একজন বৃদ্ধ লোক থলি হাতে চলেছেন। চেনা চেনা লাগল। নীলাঞ্জন কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, "আপনি ধনপতি স্যার না?" বুড়ো ভদ্রলোক হা হা করে হেসে উঠলেন। বললেন, "ধনও গেছে, স্ত্রীও কবে গত হয়েছেন, তবু আজও নামটা আমার ধনপতিই বটে। তা আপনাকে তো চিনতে পারছি না?"

নীলাঞ্জন বলল, "স্যার, আমি নীলাঞ্জন গুপ্ত। অমুক সালে জগমোহন ইন্স্টিটিউশনে আপনার ছাত্র ছিলাম।"

ধনপতিবাবু খানিকক্ষণ যেন স্মৃতির থলিতে হাতড়ে বেড়ালেন। তারপর মুখে হাসি ফুটল। বললেন, "হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তুমি তো সেই জজসাহেবের ছেলে।"

নীলাঞ্জন বলল, "বাবা রিটায়ার করেছেন আজ ক' বছর। তা আপনি এখানে কোথায়?"

ধনপতিবাবুর ঝলসানো মুখে কালো ছায়া পড়ল। "সে কাহিনী শুনে আর কি করবে নীলাঞ্জন। থাকি এপাড়ার একটা এঁদো গলিতে। তুমি যদি একবার আস বড় খুশী হব। এই নাও আমার ঠিকানা।"

তারপর সোজা হাঁটা দিলেন। ধনজা নামটা কাব্যিক অর্থে আজ তাঁকে বড়ই বেমানান।

সুধাময়ের কথা মনে পড়ল নীলাঞ্জনের। ধনপতিবাবুর বাড়ী একদিন যাবে ঠিক করল। ওঁর তো একটা বাচ্চা মেয়ে ছিল, কি যেন নাম।

ধনপতিবাবুর নির্ধন সংসারে প্রথম দিন গিয়েই নীলাঞ্জন বুঝতে পারল ওখানে তাকে যেতে হবে বারবার। কড়া নাড়তেই ধনপতিবাবু দরজা খুলে দিলেন। বললেন, "শেষ পর্যন্ত এলেই তা হলে"। দিনটা ছিল বিষ্যুদবার। এক কোণে লক্ষ্মীর পট সামনে রেখে পাঁচালি পড়ছিল একটি মেয়ে। সুরেলা গলা। সস্তা একটা তাঁতের শাড়ি পরনে। আঁচলের বেড়া ভেদ করে নেমে এসেছে কালো চুলের বন্যা। পুজো শেষ হল। শাঁখে ফুঁ দিতে গিয়ে মেয়েটির দুটি মসৃণ শ্যামল গাল ফুলে উঠল। তারপর প্রণামের শেষে এক টুকরো শসা আর বাতাসা নীলাঞ্জনের হাতে দিয়ে মেয়েটি বলল, "কেমন আছেন নীলাঞ্জনদা? অনেক, অনেক দিন পর।" বড় বড় কালো চোখগুলো বড্ড বেশী ঠান্ডা। ধনপতিবাবু বললেন, "এই আমার মেয়ে সীতা। ওকে কি তোমার মনে আছে নীলাঞ্জন?" নীলাঞ্জন মাথা নাড়ে। হ্যাঁ, মনে আছে, আর বোধহয় কোনদিন ভোলা যাবে না।

(না ভোলেনি সে আজও। আজ সীতা নেই। স্বেচ্ছায় চলে গেছে দুঃখ-মৃত্যুবিরহদহনজ্বালাময় এ পৃথিবী থেকে। আজ শ্যামলী এনেছে নীলাঞ্জনের

ধূসর জীবনে সাহচর্যের শ্যামল ছায়া। কিন্তু এখনও সে মাঝে মাঝে কানে কানে শোনে সীতার গলা, তার কথা।—কিছু বাস্তবানুগ, কিছু মনগড়া। বেশী মদ খেলে সেই কণ্ঠস্বরের অনুরণন এত কাছে আসে, এত বাস্তব হয়ে ওঠে যে নীলাঞ্জন সরল সত্য আর নিছক কল্পনার মধ্যে সীমারেখাটা হারিয়ে ফেলে। ভয়ে মুষড়ে পড়ে সে তখন। মনে পড়ে সেই পনের-কুড়ি দিনের অসহ্য যন্ত্রণার কথা। যখন সে অবাস্তবকে বাস্তব বলে মনে করতে শুরু করেছিল। চোখের সামনের কঠিন বাস্তবকেও স্বীকার করতে যখন তার দ্বিধা হত। ডাক্তারেরা বলেছিলেন নার্ভাস ব্রেকডাউন। নীলাঞ্জনের বিশ্বাস কয়েক দিনের জন্য তার মাথা খারাপ হয়েছিল। যার জের এখনও কাটেনি।)

সীতার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা কি করে দিনে দিনে বেড়ে গিয়েছিল তার ব্যাখ্যা খুঁজতে আজ নীলাঞ্জন কোন উৎসাহ পায় না। ব্যাখ্যাটা হয়তো খুব সহজ। একটি আবেগপ্রবণ যুবক আর একটি উঠতি বয়সের সুশ্রী স্নিগ্ধ মেয়ে, কাছাকাছি এসেছিল নিতান্তই আকস্মিকভাবে, তারপর পরিণতি প্রায় অবশ্যম্ভাবী ছিল। সীতা অবশ্য প্রায়ই নীলাঞ্জনকে জিজ্ঞাসা করত সে আর কোন মেয়েকে চেনে কি না। নারীসুলভ ঈর্ষা আর কৌতূহলবশত নয়। কি যেন একটা তলিয়ে দেখতে চাইত সে। নীলাঞ্জনের সত্যি তখন আর কোনও বান্ধবী ছিল না। কলেজের সহপাঠিনীদের সঙ্গে তার কোনদিন বিশেষ কোন অন্তরঙ্গতা হয়নি। তাই সে অকপটে স্বীকার করত আর কোনও তরুণী তার জীবনের ত্রিসীমানায় আসেনি। সীতা বলত, "তা হলে কি করে জানলে তুমি আমাকেই ভালবাস। আর কারও সঙ্গে তো মেপে নিয়ে যাচাই করতে পারনি এখনও।" নীলাঞ্জন খানিকক্ষণ চুপ করে থাকত। তারপর হেসে উঠত। সীতাও হাসত। যৌবন জলতরঙ্গ।

বি এ পাশ করার পর ঠিক হল নীলাঞ্জন বিলেত যাবে। বিলেত যেতে নীলাঞ্জনের উৎসাহ কিছু কম ছিল না। সীতাও উৎসাহ দিত। তবু মাঝে মাঝে মুখ ম্লান হয়ে যেত ওর। 'তিন তিনটে বছর আমি কেমন করে থাকব? আর ফিরে এসেই বা বিলেত ফেরত তুমি কি একটা গরীব মাস্টারের মেয়ের দিকে ফিরে চাইবে।' নীলাঞ্জন রেগে যেত। বলত, "ন্যাকামি কোরো না। ভবিষ্যতের কথা নিয়ে এ ধরনের বাজে কথা আমার ভাল লাগে না।" সীতা শক্ত মুখে তাকিয়ে থাকত। বিশ্বাসে দৃপ্তা।

যাবার আগের দিন সীতা বলল, "চলে তো যাচ্ছ। মনে রাখার মত একটা প্রেজেন্ট দেব তোমায় আজ।" নীলাঞ্জন বলল, কি প্রেজেন্ট? সীতা ওর ঠোঁট দিয়ে মুম্‌মুম্‌ করে একটা শব্দ করল, চোখ দুটিতে কেমন লজ্জা লজ্জা। সীতা নীলাঞ্জনের দুবছরের মেলামেশায় অঙ্গীকার অনেক থাকলেও অঙ্গের উত্তাপ প্রায় ছিল না। নীলাঞ্জন জোর করে চায়ওনি কোনদিন। তাই সেদিনের প্রতিশ্রুতিতে তার রক্ত টগবগ করে উঠেছিল। হঠাৎ সে সীতার ঠোঁটে খানিকটা গ্লিসারিন ঘষে দিল। ওকে জড়িয়ে ধরে ওর গ্লিসারিনমাখা মিঠে মিঠে ঠোঁট দুটোয় চুমু খেল। খানিকক্ষণ শুধু চুমু। তারপর সাহস বেড়ে গেল নীলাঞ্জনের। অবাধ্য হাতদুটো সীতার নরম পেঁজা তুলোর মত স্তনদুটো স্পর্শ করল। সীতার মুখে এক ঝলক রক্ত। নীলাঞ্জনের মুখে শুধু এক কথা। "একবারটি, একবারটি

খুলে দাও লক্ষ্মীটি। শুধু একবার।” সীতা দুটি তাজা ফুল সঁপে দিল নীলাঞ্জনের হাতে। এক নিমেষের জন্য। তারপর ঝট করে সরে গেল। বলল, “বাস্। আজ আর না: বিলেত থেকে ভাল ছেলের মত ফিরে এস। বাকী সব পাবে।”

(নীলাঞ্জন : স্মৃতিচারণ)

নীলাঞ্জন মনে মনে নিজের কথা ভাবে।

তুমি তো জান সীতা ভাল ছেলের মতই বিলেত থেকে ফিরে এসেছিলাম। ভাল ছেলে থাকা খুব সহজ ছিল না। কোপেনহেগেনে একটা শক্ত ফাঁড়া ছিল কপালে। একটি স্বর্ণকেশী নীলনয়না আমার কালো চুলের মোহন রূপে এতই মুগ্ধ হয়েছিল যে একটিবার অন্তত আমাকে পাবার জন্য সে কম সাধ্যসাধনা করেনি। চরিত্র বস্তুটা ওসব দেশে অন্য মাপকাঠিতে বিচার করা হয়। কিন্তু সে দেশের বিচারেও কত রকমের চরিত্রহীনতা দেখেছি জাতভাইদের মধ্যে। অনেকেই আমাকে বলতেন, “ভারী তো তোমার দেশে একটা প্রেমিকা আছে। আমাদের বাপু বৌ কাচ্চাবাচ্চা রয়েছে। তাই বলে কি এখানে প্রেম দেব না? ফূর্তি করার এমন মওকা আর জীবনে পাবে না ভাই।”

অনিলবরণের কথা মনে পড়ে। শ্বশুরের পয়সায় বিলেতে এসেছিল। কিছু-দিন যেতে না যেতেই একটা ধুমসি জার্মান মেয়ে ওর নিত্য শয্যাসঙ্গিনী হয়ে দাঁড়াল। হিতাকাঙ্ক্ষীরা মহাখাপ্পা। বললেন বদমাইসি বন্ধ না করলে শ্বশুরকে জানিয়ে দেবেন, মাসোহারা বন্ধ হলে টেরটি পাবে বাছাধন। অনিল তখন কিছু-দিন ভাল ছেলে হয়ে রইল। তারপর একদিন হিতাকাঙ্ক্ষীদের কাছে গিয়ে কেঁদে পড়ল। এক মুখ দাড়িগোঁফ। বলল, টেলিগ্রাম এসেছে বৌ মারা গেছে। সবাই আহা আহা করলেন। মাসখানেক বাদে অনিলকে আবার সেই কটাচোখ হামিদা বানুর সঙ্গে দেখা যেতে লাগল। এবার কেউ কিছু বললেন না। আমি জানি অনিল এখন দেশে ফিরে তার মৃতা স্ত্রীকে ফিরে পেয়েছে।

আমি কিন্তু টলিনি সীতা। তিন তিনটে শীত আর গ্রীষ্ম আমি কাটিয়ে-ছিলাম অনায়াসলভ্য নারীসঙ্গ থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখে। বিলেতের গ্রীষ্মে যখন ঘাসে ঘাসে ফুল ফুটত, বাতাসে লাগত মদির নেশা, চারদিকে ঘুরে বেড়াত সামারফ্রক পরা হাসি খুশী মেয়ের দল, আমি শুধু ফেরার দিন গুনেছি। একদিন সেই ফিরে এলাম।

বহুদিন পর কলকাতা ফিরে এসে একটু কেমন কেমন লাগছিল। তাই প্রথম দিনই তোমাদের বাড়িতে যাইনি। আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে দেখা করে নিজেকে একটু ধাতস্থ করে নিলাম। তারপর এক সন্ধ্যায় ধুতি পাঞ্জাবী পরে তোমার বাড়ির দিকে রওনা হলাম। বাড়ি মানে তোমাদের এক চিলতে সেই ঘর।

তোমার সঙ্গে দেখা হলে কি বলব মনে মনে রিহার্স করলাম সারা পথ। কিন্তু গিয়ে দেখি তোমাদের ঘরে তালা ঝুলছে। উঁকি মেরে দেখলাম ঘরের ভেতর তোমাদের জিনিসপত্রও কিছু নেই। পাশের একটা দোকানে জিজ্ঞেস করলাম, “ধনপতিবাবুরা আর এখানে নেই?” দোকানী নতুন লোক। বলল ঐ নামে কাউকে সে চেনে না। বুঝলাম অন্য কোথাও চলে গেছ। আশ্চর্য, তোমার

শেষ চিঠি তো পেয়েছি এই সেদিন। কিন্তু ঠিকানা বদলের কোন কথা তো লেখোনি।

তারপর শুরু হল আমার অন্বেষণ। এত বড় কলকাতা শহরে ধনপতিবাবু আর তার মেয়ে সীতাকে খুঁজে পাওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। তবুও হাল ছাড়িনি। প্রায় এক যুগ পর হঠাৎ দেখা হয়ে গেল তোমার প্রিয় বন্ধু সোমার সঙ্গে। তাকে তোমার কথা জিজ্ঞেস করলে দেখি ওর মুখটা কেমন শুকিয়ে গেছে।

"আপনি কবে ফিরলেন বিলেত থেকে?" সোমা জিজ্ঞেস করল। মনে হল একটু দম নিচ্ছে যেন।

"তা মাস তিন চারেক হলো। ফিরে এসেই সীতাদের ভবানীপুরের বাড়ি গিয়েছিলাম। দেখি ওরা চলে গেছে।"

"সীতা আপনাকে চিঠি লিখত না? কেন, ও বাড়ি বদলানোর কথা লেখেনি, বা অন্য কোন কথা?"

"না তো।"

"বাঃ। আশ্চর্য ব্যাপার তো। চিঠিতে কি ঠিকানাও লিখত না?"

"ওঃ! শেষ চিঠিটাতে তো ও ভবানীপুরের ঠিকানাই দিয়েছিল।"

"রহস্য বটে। যাক্ আপনি সত্যি সীতার সঙ্গে দেখা করতে চান?"

"কেন, সন্দেহ হয় নাকি?"

"না এতদিন বিলেতে ছিলেন। শুনেছি বিলেতে গেলে মানুষ কেমন বদলে যায়। তাই!"

"সবাই হয় তো এক রকম হয় না সোমা।"

"রাগ করবেন না। হঠাৎ বলে ফেলেছি কথাটা। আচ্ছা, এই নিন সীতার ঠিকানা। অক্রূর দত্ত লেন। ধনপতিবাবু স্কুলের মাস্টারিটা ছেড়ে দিয়েছেন। সীতাও আজকাল আর কলেজে আসে না। সেই ওর একটা বড় অসুখ হয়েছিল তার পর থেকে।"

আমি যেন আবার প্রাণ ফিরে পেলাম। এত সহজে যে তোমাদের খোঁজ পাওয়া যাবে আশা করিনি। আমার আর তর সইছিল না।

অক্রূর দত্ত লেনের ঠিকানায় গিয়ে হাজির হলাম সন্ধ্যাবেলায়। চারদিক দেখেই বুঝলাম ধনপতিবাবুর অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। এ অঞ্চলটাকে প্রায় বস্তি বলা চলে। কড়া নাড়তে একটি মোটাসোটা মহিলা দরজা খুললেন। ধনপতিবাবুর নাম বললাম। উনি মুখ বেঁকিয়ে বললেন, সোজা ওপরে। ওপরের ঘরটাতে যখন গিয়ে পেঁছোলাম অন্ধকার গাঢ় হয়ে গেছে। ঘরে কিন্তু আলো জ্বলছে না। বিছানায় এই অবেলায় কে যেন চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। ঐ সংসারে আর সন্ধ্যারতি হয় না তা হলে।

আমি চেঁচিয়ে ডাকলাম, "সীতা, সীতা।" বিছানায় শুয়ে থাকা শরীরটা নড়ে চড়ে উঠল। তারপর অত্যন্ত নিস্তেজ গলায় ক'টা কথা বন্ধ বাতাসে ভেসে এল।

"নীলাঞ্জনদা। তুমি এলে শেষ পর্যন্ত। কে তোমাকে আমাদের ঠিকানা দিল?"

আমি অবাক হয়ে গেলাম। এত বছর পর দেখা। আর এই কি না সীতার অভ্যর্থনা। এই মেয়েই কি তিন বছর আগে রোজ আমার জন্য জানালা দিয়ে

পথের দিকে চেয়ে থাকত? দেরী হলে ওর চোখ ছলছল করত?

আমার খুব রাগ হল। একটু রুক্ষস্বরে বললাম, এই তিন বছরে বেশ বদলে গেছ দেখছি। এত দিন বাদে এলাম। উঠে এলে না, বসতে বললে না এমন কি লাইটটা পর্যন্ত জ্বাললে না, এমনিই বোধহয় হয়।

তুমি উত্তর দিলে খুব আস্তে আস্তে। তোমার সেদিনের কণ্ঠস্বরের আবেগ-হীন শুষ্কতা আজও আমার কানে বাজে। "বদলে গেছি। নীলাঞ্জন, খুব বদলে গেছি। কত যে বদলে গেছি তা বোধহয় তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।"

ধীরচরণে উঠে গিয়ে তুমি লাইটের সুইচটা টিপে দিলে। একটা বীভৎস আর্তনাদ কানে এল, "দেখ কত বদলে গেছি। ওগো একবার ভাল করে দেখ আমায়।"

দেখলাম। ভাল করে দেখলাম। মুখ দিয়ে কথা সরল না। আমার শুকনো চোখে জল এল না। কেমন জ্বালা জ্বালা করতে লাগল। মুহূর্তের জন্য চোখ সরাতে গিয়েছিলাম। মনের জোর ফিরিয়ে এনে পূর্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম তোমার দিকে। আমার সমস্ত বুক ঠাণ্ডা হিম হয়ে গেল।

তোমার টলটলে শ্যামলা মুখের একটা দিক পুড়ে কাল হয়ে গেছে। একটা চোখ দেখলেই বোঝা যায় পাথরের। তোমার সমস্ত মুখে যেন হৃদয়হীন বিধাতার একটা অট্টহাসি ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে।

একবার মনে হল ছুটে বেরিয়ে যাই ওঘর থেকে। তারপর আবার আমার চোখ পড়ল তোমার মুখের ওপর। এবার অবিকৃত অংশের দিকে। একটি দীর্ঘ কালো চোখে অশ্রু টলমল। আমার পা সরল না।

"ওঃ! কবে এমন হল। কী হয়েছিল? আমাকে জানাওনি কেন?"

"তোমার বিলেতের শেষ পরীক্ষার কিছুদিন আগেই আমার কপাল পুড়ল। সত্যি সত্যি আমার মুখটা পুড়ে গেল।" বলতে বলতে তুমি ভেঙে পড়লে অব্যক্ত বেদনায়।

আমি তোমার পিঠে আলগোছে একটা হাত রাখলাম। সান্ত্বনা দিলাম। "তুমি কেন এত উতলা হচ্ছ সীতা। এই তো, এই তো আমি ফিরে এসেছি।" সে মুহূর্তেও নিজের কথা নিজেই বিশ্বাস করতে পারিনি।

তুমি কিন্তু যেন একটু জোর পেলে আমার কথায়। বললে, "আমি সেদিন তোমার কথাই ভাবছিলাম। ভাবছিলাম তোমার পরীক্ষা শেষ হলেই তো তুমি ফিরে আসবে। তুমি না জানি কি রকম সাহেব হয়ে গেছ। আমাদের বাড়িতে এলে তোমায় কাঁটাচামচ দিতে হবে না তো। স্টোভে চায়ের জল বসিয়েছিলাম। হঠাৎ কিসের থেকে কি হল। আমার মুখে এসে লাগল জ্বলন্ত আগুন। অসহ্য তাপ। আমি অজ্ঞান হয়ে গেলাম। ভয়ে, যন্ত্রণায়। তারপর হাসপাতাল। তারপর এই আমি। প্রেতিনী সীতা। অর্ধেক মানবী, অর্ধেক..." তুমি আবার কাঁদতে লাগলে।

আমি কোন কথা বলিনি। কি আর বলার ছিল। শুধু বুঝেছিলাম কথা বললে ঐ বিষণ্ণ সন্ধ্যা আরও বিষিয়ে যাবে।

অনেকক্ষণ পর। যেন এক যুগ পর। কাঁপা কাঁপা গলায় বলেছিলাম, "তোমার কোন চিন্তা নেই। এই সামান্য দুর্ঘটনায় আমাদের ভালবাসায় কিছু যায় আসবে না।" আমার আত্মপ্রবঞ্চনার সেই শুরু।

তুমি ঘাড় নেড়ে বলেছিলে, "কি জানি। আজ আমার আর কোন কথা বিশ্বাস করতে মন চায় না।"

তারপর ধীরে ধীরে তুমি বললে, তোমাদের দুঃখের কাহিনী। তুমি সবাইকে বলেছিলে, তোমার অ্যাক্‌সিডেণ্টের কথা যেন আমি কোন মতেই না জানতে পারি। আমার তখন পরীক্ষা সামনে। খবর পেলে আমার শুধু শুধু কণ্ট হবে। পরীক্ষার ক্ষতি হতে পারে। তোমার বাবা অনেকদিন ধরেই কেমন যেন হয়ে গিয়েছিলেন। এবার একেবারে ভেঙে পড়লেন। স্কুল মাস্টারিটা ছেড়ে দিলেন। প্রাইভেট টিউশনিতে সংসার চলে—যদি তাকে চলা বলা যায়। তোমরা উঠে এলে কম ভাড়ার এই এ'দো কুঠুরিতে। ঠিকানা বদলের কথাও আমাকে জানাওনি। তুমি চেয়েছিলে তোমার এই বিকৃত রূপ যেন আমি আর খুঁজে না পাই।

আমি তোমাদের বাড়ি যেতাম। দিনের পর দিন। তোমার সঙ্গে সহজভাবে কথা বলেছি। ঠাট্টা ইয়ার্কি করেছি। যেন কিছু হয়নি। ধনপতিবাবুর সঙ্গেও গল্প করতাম। বিলেতের কথা, রাজনীতি আরও কত কি। ভাব দেখাতাম, সব ঠিক আছে, চলছে চলবে। এর মধ্যে নিজের একটা ডেরা খুঁজে নিয়েছিলাম তোমাদের অক্রূর দত্ত লেনের কাছাকাছি। দিনের শেষে যখন নিজের ঘরে ফিরে আসতাম অসহ্য ক্লান্তি নামত দেহে মনে। দিনের পর দিন এ কি কঠোর পরীক্ষা। বেশ বুঝতে পারতাম তোমার সঙ্গে সেই পুরোনো স্বাভাবিক সম্পর্ক আর কোনদিন ফিরে পাব না। কিন্তু তোমার তো কোন দোষ নেই। নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতাম রাত্রিদিন। আমার মন আস্তে আস্তে এক গভীর বিষণ্ণতার অন্ধকারে কুঁকড়ে যেতে লাগল। আমি মদ খেতে শুরু করলাম।

মদ আমি আগেও খেয়েছি বেশ কয়েকবার। কিন্তু এবারকার মদ খাওয়ার চেহারাটা আলাদা। হৈ হৈ করার জন্য এ মদ খাওয়া নয়। বিদ্রোহী স্নায়ুগুলো শিথিল করার জন্য এ নিঃসঙ্গ বিষপান। তুমি মাঝে মাঝে আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে। একদিন বলেই ফেললে, "আর কতদিন এ রকম চলবে নীলাঞ্জন। তুমি পুরুষমানুষ। তোমার কি ব্লাডপ্রেশার বলে কিছু নেই? এ কায়াহীন প্রেম বাস্তবে টিকে থাকে না বেশীদিন।"

সেদিন রাতে একটু নেশা করে নিজেকে তলিয়ে দেখলাম। চেষ্টা করলাম তোমার ঐ বিকৃত রূপের সঙ্গে চূড়ান্ত মিলনের মধুর কল্পনায় নিজেকে উত্তেজিত করতে। প্রতিটি রোমকূপ প্রতিবাদ জানাল। না, সত্যি আমাদের কোন ভবিষৎ নেই। কিন্তু মুক্তি মানে তো নৈতিক মৃত্যু। সে আমার নয়।

তারপর এল সেই ভয়াবহ সন্ধ্যা। সেদিন আমার বিষণ্ণতার বোঝা এত অসহনীয় মনে হচ্ছিল যে দিনের বেলা থেকেই মদ খেতে শুরু করেছিলাম। কি থেকে কি হয়ে গেল আমার। একটা ট্যাক্সি চেপে ফ্রী স্কুল স্ট্রীট চলে গেলাম। সেখান থেকে ঘরে নিয়ে এলাম এক অনামিকাকে। আরও মদ খেলাম। অবশেষে বিবস্ত্র সে নারীদেহের বিক্রীত উত্তাপে আত্মসমর্পণ করলাম। তার শরীরে আছড়ে পড়ে আমার বিবেক বিড়বিড় করে তোমার নাম উচ্চারণ করেছিল, সীতা, সীতা সীতা। সে পসারিনীর নামের দাম নেই। সে কখনও সীতা, কখনও সাবিত্রী, কোন দেবদাসের কাছে আবার চন্দ্রমুখী। সে শুধু একটি দেহ। পুরুষের প্রয়োজন মেটায়।

পরের দিন সকালে সমস্ত শরীর ক্লান্ত, মন পঙ্কিল। ক্লেদ, চারিদিকে ক্লেদ। এমন সময় পাগলের মত ছুটে এলেন ধনপতিবাবু। বললেন, "সীতা নেই। কাল রাতে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে মুখপুড়ি।" খালি গায়েই ছুটলাম তোমাদের বাড়ি। দেখি একজন এস আই বসে আছেন। আমাকে দেখে বললেন, "স্যাড কেস মশাই। সুইসাইড। নো ডাউট এবাউট ইট। চিঠি রেখে গেছে। আপনার জন্যও একটা চিঠি আছে স্যার। আমি কিন্তু পড়েছি।" আমার ইচ্ছে হল লোকটার গালে ধাঁ করে একটা চড় বসিয়ে দিই। কাঁপা হাতে চিঠিটা খুললাম। ছোট্ট চিঠি, "নীলাঞ্জন, তুমি আমার চেয়েও দুঃখী নীলাঞ্জন। তোমাকে মুক্তি দিলাম।— তোমার সীতা।" স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলাম পোকার মত কালো অক্ষরগুলোর দিকে। কাল রাতে তুমি এসেছিলে সীতা, এসেছিলে আমার ঘরে। দেখেছিলে ভালবাসার অশ্লীল সে রূপ। কিন্তু কেন এ ভুল করলে? কত ক্ষমতা তোমার সীতা, যে নীলাঞ্জনকে এত সহজে মুক্তি দিতে পার?

৭

(নীলাঞ্জন : স্মৃতিচারণ)

নীলাঞ্জন জীবনে দু-একজন লোক দেখেছে যারা কখনও সত্যিকারের দুঃখ পায়নি। এমন কি শ্যামলীর ক্ষেত্রেও কথাটা খাটে। খুব বড় রকমের একটা ধাক্কাও জীবনে খায়নি বলে এইসব লোক ছোটখাটো দুঃখে খুব মুষড়ে পড়ে। মাঝে মাঝে ছোটখাটো দুঃখ অতিরঞ্জিত করতেও তাদের বাধে না। খুব নিকটজনের মৃত্যুর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা জীবনবোধে খুবই প্রয়োজনীয়। সব দুঃখই সহনীয়, সব অভাবই আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়। একটা সময় ছিল সীতা ছাড়া জীবন নীলাঞ্জনের কাছে কল্পনাতীত ছিল। কিন্তু সেই সীতা চলে গেল। নীলাঞ্জন আজও বেঁচে আছে। খুব খারাপভাবে বেঁচে আছে কি? মনে হয়না তো। কাজের চাপ যখন খুব বেড়ে যায়, কাজে যখন মন বসে তখন তো সীতার স্মৃতি তাকে বিচলিত করে না। শ্যামলীর সঙ্গে দেহমিলনের চূড়ান্ত মুহূর্তে সীতার মুখ কখনও বাধা সৃষ্টি করে না। শুধু মন যখন শূন্য হয়ে যায়, অলস মুহূর্তে কল্পনা যখন একমাত্র সম্বল, তখনই সীতা তার সামনে এসে দাঁড়ায়, কথা কয়, তার স্নায়ুগুলো দুর্বল করে তোলে।

যৌবনে নীলাঞ্জন একটা বিষয় নিয়ে অনেকের সঙ্গে তর্ক করেছে। তার এক ইংরেজ শিক্ষক একবার বলেছিলেন যে হেমিংওয়ের ফেয়ারওয়েল টু আর্মস উপন্যাসটির মূল কথা প্রেমের ভঙ্গুরতা। সেই ক্যাথারিন নামে একটি মেয়ে একটি ছেলেকে ভালবাসত। আর ছেলেটি যুদ্ধে মারা গেল। এমন সময় নায়কের প্রবেশ। অল্প কদিনেই দেহমিলন, গভীর প্রেম আর পরিশেষে চরম বিচ্ছেদ। উপন্যাসটির মূল কথা প্রেমের ভঙ্গুরতা কিনা নীলাঞ্জন ঠিক জানে না—এক হেমিংওয়েই জানতেন। কিন্তু বক্তব্যটি তার তখন ভাল লাগেনি। বিস্মৃতি কি এতই সহজ। আজ তার ধারণা পালটেছে। বিস্মৃতি সহজ ত নয়ই, বোধ হয় সম্ভবই নয়। কিন্তু অভিজ্ঞতার ঋতু বদলায়। তার বিভিন্ন পর্যায় আছে। সীতাও সত্য, শ্যামলীও সত্য। কিন্তু যেদিন সীতা সত্য, সেদিন শ্যামলী নেই। আর শ্যামলী যখন সত্য, সীতা তখন অনুপস্থিত। কতগুলো মুহূর্ত থাকে সব মানুষের, যেগুলো তার একান্তই নিজস্ব। সেইসব মুহূর্তেই সীতা আর শ্যামলীর সহাবস্থান সম্ভব। কল্পনার খেলায় সেইসব মুহূর্তে সীতা আর শ্যামলীর মধ্যে বিরোধিতা নেই। বরং তারা পরস্পরের পরিপূরক।

সাধারণ মানুষের থেকে অবশ্য নীলাঞ্জন একটু আলাদা। শোকের দ্রবীভবনে তার একটা বড় অস্ত্র আছে। সে বছরের পর বছর মদ খেয়েছে। মদ তাকে খেয়েছে।

মদে চুর হয়ে সে জীবনকে উপভোগ করেছে, জীবনে বীতশ্রদ্ধ হয়েছে। মাতাল হয়ে রাস্তায় পড়ে তার মাথা ভেঙেগেছে অনেকবার, কপাল কেটেছে, থুতনি ফেটে গেছে। পরের দিন সকালে মানসিক গ্লানির পীড়নে সে শারীরিক ব্যথাকে উপেক্ষা করতে পেরেছে। এ ধরনের বেদনার পৌনঃপৌনিকতায় মূল শোক অনেকটা ক্ষীণ হয়ে যায় সেটা বোধহয় একরকম সত্যি। আবার সুরার প্রভাবে মনের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে যে উত্তেজনা আসে তাতে অন্তত সাময়িকভাবে শোকের তীব্রতা বাড়ে। সাধারণ গৃহস্থজীবনে অনুভূতির এত প্রাবল্য সম্ভব হয় না।

প্রেমের পাত্রপাত্রী বদল যদি কোন কোন ক্ষেত্রে সম্ভব না হয়, শোকের নতুন ঢেউ-এর আঘাতে পুরোনো ঢেউ দূরে সরে যায়। নীলাঞ্জন তা নিজের জীবনে উপর্যুপরি শোকের অভিজ্ঞতায় উপলব্ধি করেছে। শোক এসেছে তার জীবনে বিচিত্র বিশৃঙ্খলার ভেতর দিয়ে। তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। সীতার মৃত্যুর পর তার জীবনে বিশৃঙ্খলাই ছিল স্বাভাবিক রীতি।

বাবার মৃত্যুর কথা নীলাঞ্জনের আজও মাঝে মাঝে মনে পড়ে। বেশ কিছুদিন আগেই সে সীতাদের বাড়ির কাছে তার ছোট ডেরাটি ছেড়ে নিজেদের বাড়িতে ফিরে এসেছিল। কিন্তু পুনর্মূষিক হয়নি। অর্থাৎ তার দৈনন্দিন মদ্যপান থেকে সে একটুও বিরত হয়নি। মাঝে মাঝে নেশার ঘোরে সে এতই অচেতন হয়ে পড়ত যে সাঙ্গাতদের আড্ডাতেই রাত্রি কাটিয়ে দিত। পরের দিন সকালে সারা শরীরে অসহ্য ব্যথা আর মনে অদ্ভুত এক-রকমের শূন্যতা নিয়ে সে নিজের ঘরে ফিরে আসত। একদিন সকালে ঠিক সে-রকম ফিরে এসেছে। কেমন যেন তার গা ছমছম করছিল বাড়ি ঢুকতে। দেখল শুকনো মুখে এক ভাইপো দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সে একটু হেসে জিজ্ঞেস করল, "কি রে, এখানে কি করছিস?"

ভাইপো ভাবলেশহীন মুখে তার দিকে তাকিয়ে বলল, "কাল মাঝরাতে দাদু মারা গেলেন। অনেক দিন হার্টের অসুখে ভুগছিলেন।"

নীলাঞ্জন স্থানুর মত দাঁড়িয়ে রইল। মুখ দিয়ে কথা সরল না। হ্যাঁ, সে শুনেছিল কয়েকবার বাবার শরীর ভাল যাচ্ছিল না। কিন্তু সে পরে ভুলে যেত। করারও কিছু ছিল না তার। আর, এ আর আশ্চর্য হবার কি যে বাবার মৃত্যু সংবাদ তাকে পরের দিন সকালে নাবালক ভাইপোর কাছে শুনতে হল।

আস্তে আস্তে নীলাঞ্জন তার নিজের ঘরে চলে এল। বাড়ির সবাই তার প্রত্যাবর্তন লক্ষ্য করল, কিন্তু কেউ কিছু করল না। সবার সামনে গিয়ে দাঁড়াবার আগে ওর একটু মানসিক প্রস্তুতির প্রয়োজন। দীর্ঘকাল যারা তার জীবন থেকে দূরে সরে ছিল আজ তারা তাকে এই প্রস্তুতিটুকুর সুযোগ দিল। এই মানসিক লেনদেন এক রক্তের সম্পর্কের আওতায়ই সম্ভব।

বেশ কিছুক্ষণ পর দাদা ঘরে এসে বললেন, "মুখ হাত পা ধুয়ে নিয়ে জামাকাপড়গুলো বদলে নে। শ্মশানে যেতে যেতে সেই বেলা দশটা হবে।"

নীলাঞ্জন বলল, "ঠিক আছে।"

বাংলা এই শব্দ দুটোর মত অর্থহীন কথা বোধহয় আর কিছুই নেই। কিছুই ঠিক নেই। তবু সবাই বলে, ঠিক আছে।

নীলাঞ্জন জামাকাপড় বদলাতে বদলাতে ভাবল, না আজ তাদের বাড়িতে কিছুই ঠিক নেই। আর কোনদিন কিছুই ঠিক হবে না। বড় একটা গাছ ভেঙে

গেল, এখন শুধু ডালপালাগুলোই অবশিষ্ট রইল। পাতা শীগগিরই শুকিয়ে যাবে।

সারা শরীর ক্লান্ত। মনটা বেজায় ফাঁকা হয়ে গেছে। শোক নয়, একটা কেমন অজ্ঞাত অনুভূতিতে বুকটা টনটন করছে। মৃত্যু নীলাঞ্জনের কাছে অপরিচিত নয়। কিন্তু সীতার মৃত্যুতে যে শোক তাকে আচ্ছন্ন করেছিল, সেটা ছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত সমস্যা। আজ তাকে একটা পারিবারিক, সামাজিক শোকে যোগ দিতে হবে। শুধু সামাজিক অনুশাসনেই নয়। রক্তের টানে।

ঠিক সেই মুহূর্তে বাবার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু মনে করতে পারল না নীলাঞ্জন। মৃতদেহ এখনও দেখেনি। বাবার শেষ বয়সের মুখটা মনে করার চেষ্টা করল সে। কিন্তু মনে এল শুধু তাকে লেখা বাবার শেষ চিঠিটা। বহুদিন ধরে তাদের দুজনের মধ্যে যোগাযোগ প্রায় ছিন্ন হয়ে গেছল। তার অপর্যাপ্ত মদ্যপান, কর্মক্ষেত্রে ব্যর্থতা—সব খবরই বৃদ্ধের কানে পেঁছোতো। মাঝে মাঝে তিনি নীলাঞ্জনকে লম্বা লম্বা চিঠি পাঠাতেন, ইংরিজীতে টাইপ করা। ঠিক হিতোপদেশ নয়। কথা বলার দুর্বল প্রয়াস।

নীলাঞ্জন ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল বাবার ঘরে। বাবার মৃতদেহ দেখার চেয়েও কঠিন কাজ তার সামনে। তাকে দেখতে হবে তার জীবিতা মাকে, আজ এই মুহূর্তে হঠাৎ যার জীবনের অনেকটা হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। ঘরে গিয়ে প্রথমেই চোখ পড়ল বাবার নিমীলিত দুটি চোখের উপর। মুখটা হাঁ করা, অসহায়তার চরমতম ছবি একটি। তারপর চোখ গেল মার দিকে। পাথরের মত বসে রয়েছেন। চেঁচিয়ে কাঁদার মত মানুষ নীলাঞ্জনের মা নন। আঘাতে বোবা হয়ে যান তিনি। এক মুহূর্ত অজানা একটা ভয়ে শিউরে উঠল নীলাঞ্জন। মা আবার মুখ খুলবেন তো। আস্তে আস্তে গিয়ে সে মার হাতটা চেপে ধরল। বৃদ্ধা মার জীর্ণদেহ ক্ষণিকের জন্য কেঁপে উঠল শুধু। ভাঙা গলায় বললেন, প্রণাম কর।

তথাকথিত বুদ্ধিজীবী বিলেতফেরত উচ্ছৃংখল উদ্ধত নীলাঞ্জন যন্ত্রের মত এগিয়ে গিয়ে বাবার পায়ে হাত দিল। কত বছর পর। তারপর অপরাধীর মত সবার পেছনে সরে এল।

অপরাধবোধে সে বোধহয় সেই মুহূর্তে মাটিতে মিশে যেতে রাজী ছিল। বাঁচিয়ে দিল তাকে তুচ্ছ একটা ঘটনা। কে যেন একজন ফোটোগ্রাফারকে ডেকে এনেছিল। তিনি ক্যামেরার অ্যাংগল নিয়ে এত বাড়াবাড়ি শুরু করলেন যে ক্ষ্যাপার মত সে চেঁচিয়ে উঠল, "তাড়াতাড়ি করে নিন।" সবাই তার দিকে তাকাল। কোন চোখেই ভর্ৎসনা নেই। সেই মুহূর্তে তার থেকে বড় স্বীকৃতি আর কি হতে পারত?

বাঙালী সমাজের নানাবিধ অশালীন প্রথার মধ্যে একটি হল শ্মশানযাত্রা। একদিকে যেমন আছে পাড়ার পরিচিত স্বল্প-পরিচিত এমন কি অপরিচিতদের সহানুভূতি সহায়তা এবং সাহচর্য তেমনি অন্যদিকে কখনো কখনো দেখা দেয় অকারণ হরিবোল ধ্বনির উচ্চকণ্ঠের অভব্যতা। আজকাল রৌদ্রতপ্ত পীচঢালা পথে রবারের চটি পরার অনুমতি মেলে। কিন্তু নীলাঞ্জন খালি পায়ে এগিয়ে চলল, গত রাত্রের পাপের প্রায়শ্চিত্ত এক ধরনের। খানিকটা হাঁটার পর সমবয়সী এক আত্মীয় বলল, নাও একটা সিগারেট ধরাও। নীলাঞ্জন প্রথমে একটু ইতস্তত করল। পরিণত বয়সেও বাবার সামনে সে সিগারেট খেত না। আজ তিনি চলেছেন

শেষ যাত্রায়। আজ সিগারেটটা তার প্রাণহীন দেহের এত কাছে না ধরালেই বোধহয় ভাল হত। কিন্তু সারা শরীর অবসন্ন। নীলাঞ্জন প্রয়োজনের সঙ্গে সন্ধি করল। একটা সিগারেট ধরিয়ে এক মিনিট কি ফুরফুরে সতেজভাব ফিরে পেল। তারপর আবার পেটে জ্বালা। যকৃতে পচন শুরু হয়েছে। তার ওপর গতকাল দুপুরের পর পেটে মদ ছাড়া আর কিছু পড়েনি।

কেওড়াতলা কথাটা নীলাঞ্জনের কাছে কতকটা আভিধানিক শব্দের মত ছিল। পরে অবশ্য অনেকবার গিয়েছে, কিন্তু জায়গাটার সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় সেদিন। সীতার মৃত্যুর সময় সে সম্পূর্ণ আত্মগোপন করেছিল সারি সারি মদের বোতলের পেছনে। মানুষের জীবনাবসানেও দফতর-ই পদ্ধতির কি দাপট। এখানে ফর্ম সই কর। চুল্লির জন্য লাইন লাগাও। একে পয়সা দাও, ওকে চা খাওয়াও। পরে ভেবে দেখেছে নীলাঞ্জন, একদিক দিয়ে এ সব আপাত অসহনীয় বাধাগুলোর খানিকটা উপকারিতা আছে। দুঃখের সঙ্গে মোকাবিলায় তিক্ততার মত বন্ধু আর নেই। দিনান্তে যখন পাখিরা গাছের ডালে তাদের ডেরায় ফিরে আসে বাবাও চলে গেলেন তাঁর শান্তির আশ্রয়ে। সংলগ্ন গঙ্গানামধেয় মল-মূত্রবাহী এক নালার জলে হাত ডুবিয়ে নীলাঞ্জন দেহমনের পবিত্রতা ফিরে পেল।

বাড়ি ফেরার পর সকলেই নীলাঞ্জনের দিকে করুণভাবে তাকিয়ে রইল। অভিযোগ নেই। অনুরোধ মাত্র। স্পর্শকাতর নীলাঞ্জন চোখের ভাষা বুঝতে পারে। পিতৃবিয়োগে স্বভাবসিদ্ধ মদ্যপানে সাময়িক যতি টানার পেছনে বুদ্ধিতে গ্রহণযোগ্য কোন যুক্তি নেই। কিন্তু নীলাঞ্জন বলল, তের দিন সে বাড়ি থেকে বেরুবে না ; হবিষ্যিই খাবে। কেউ বাহবা দিল না, শুধু তের দিনের শেষে আত্মীয়দের মধ্যে একজন যখন তাকে বংশের কুলাঙ্গার বলে দুঃখ করতে শুরু করলেন, তার বিধবা মা নিঃশব্দে সেখান থেকে উঠে চলে এলেন। নীলাঞ্জনের স্বল্পকালীন সংযমের সেই শ্রেষ্ঠ প্রতিদান।

দিনের পর রাত, রাতের পর দিন। বাবার মৃত্যুর ধাক্কা থেকে সবাই একটু একটু করে সামলে উঠছে। কিন্তু যৌথপরিবারের ভগ্নাবশেষ একসঙ্গে ধরে রাখার ক্ষমতা কারুর আজকাল নেই। সাম্রাজ্যের পতন শুরু হলে গৃহযুদ্ধ অবশ্য-ম্ভাবী। মদ্যপ নীলাঞ্জন এই গৃহযুদ্ধে মুরাদের মত শুধু ব্যবহৃত হতে পারত। সহজেই ঘায়েল হওয়া ছাড়া আর কোন পরিণতি তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। নীলাঞ্জন তাই পালাল তার সামান্য কয়েকটি নিজস্ব সামগ্রী নিয়ে কেউ কিছু বললে সে তাদের শোনাত অন্যের মুখে শোনা অভিনেতা রিচার্ড বার্টনের একটি উক্তি। "আমি আঠার দিন মদ ছেড়ে সংসারী হতে চেষ্টা করেছিলাম। যা দেখে-ছিলাম এই আঠার দিনে মদের বোতল আবার আঁকড়ে ধরার জন্য তা যথেষ্ট।" কথাটা অবশ্য নীলাঞ্জনের ক্ষেত্রে মোটেও খাটে না। সে মনে মনে তা স্বীকার করত।

নীলাঞ্জন আজ মাত্রাতিরিক্ত পান করে না। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত পান করার বিরুদ্ধে আজও তার বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ নেই। মনে মনে সে আজও স্বীকার করে যে সঙ্গে মদ না থাকলে মানুষের সঙ্গ তার ভাল লাগে না। অনেকের কাছে সে শুনেছে যে দুঃখের জন্য মদ খাওয়া একটা যা-তা ব্যাপার, এক রকমের বিলাস। বিলিতি সিগারেটের ধোঁয়ায় গাড়ীর ভেতর তরঙ্গ সৃষ্টি করে এক সিনেমা-নায়ক বন্ধু তাকে একবার বলেছিল, "সন্ধ্যা ছ'টার পর দুঃখ ভোলার

এই চমৎকার পদ্ধতি বিলিতি সাবান মাখার মতই শৌখিনতা।" নীলাঞ্জন উত্তরে শুধু বলেছিল, "একটা সিগারেট দাও তো। বহুদিন বিলিতি সিগারেটের সুগন্ধ নাকে যায়নি।"

রেপার্টি হিসেবে মন্দ হয়নি। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা কি? মদ খাওয়ার জন্য মাতালের কোন যুক্তি দেখানোর দরকার হয় না। মাতালের মুখে মদের গন্ধ না থাকলেও সে মাতাল। কিন্তু মানুষ তো আর হঠাৎ মদ্যপ হয় না। কেমন করে হয়? ঝিলিক দেওয়া উত্তর অবশ্য রেডিমেড আছে। সেই হেমিংওয়ের ফিয়েস্টা উপন্যাসের এক চরিত্রের উক্তি। আমি ধীরে ধীরে এবং সহসা অ্যালকহলিক হয়েছি। কথাটায় শুধু ঝিলিক না, খানিকটা গভীরতা আছে। ধীরে ধীরে এবং সহসা। মদের নেশা যেমন ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে, তারপর সহসা চেতনার অবলুপ্তি ঘটায়, মাতাল আখ্যা পাওয়ার পশ্চাদ্ভূমিও ঠিক সেই রকম ধীরে ধীরে উঁচু হতে হতে হঠাৎ ঢালু হয়ে গড়িয়ে যায়। নীলাঞ্জন মদ ধরেছিল সীতার অপ-মৃত্যুর শোক থেকে মুক্তি পাবার জন্য। তারপর সে আবিষ্কার করল সে ঢালুর দিকে গড়াচ্ছে। তখন নেশার জন্য চাই মদ, নেশার খোঁয়াড়ী ভাঙ্গার জন্য চাই মদ, আবার নেশার জন্য চাই মদ—সবার উপরে মদই সত্য, তাহার উপরে নাই।

মাতালের মদ খাওয়ার পেছনে যে শারীরিক তাগিদ তা মাতাল ছাড়া আর কেউ বুঝতে পারবে না। মদোমাতালের সুপ্রভাত বলে কোন জিনিস নেই। ঘুম থেকে ওঠা একটা বিভীষিকা। কপালের উপর মনে হয় সমগ্র মেদিনী চেপে বসে। জিভে হাজার বছরের পুঞ্জীভূত বিস্বাদ। উদরে ধিকিধিকি অগ্ন্যুৎপাত। কিন্তু অচিরেই মুস্কিল আসান হতে পারে। বিষে বিষক্ষয়। আবার হাত বাড়াও বোতলের দিকে। দু গেলাস পেটে পড়লেই জীবন সহনীয় হয়ে ওঠে। আর একটু অগ্রসর হলে যা কিছু বিবর্ণ তাতে দেখা দেয় রঙের জলুস।

বাড়তি কিছুও জোটে মদের বোতলের দাক্ষিণ্যে—যেমন সাহচর্য। বসুধৈব কুটুম্বকম কথাটার যাথার্থ্য একমাত্র মদের টেবিলেই বোঝা যায়। মদ সব ব্যবধান ঘুচিয়ে দেয়। সামাজিক, অসামাজিক, বুদ্ধিমান, নির্বোধ, বলবান, দুর্বল সব রকমের মানুষই মদের গেলাস হাতে নিয়ে সেতু বন্ধন করতে পারে। নিঃসঙ্গ জীবনে এটা একটা বড় রকমের পাওয়া। নীলাঞ্জন জানে মদে নিজেকে ডুবিয়ে না দিলে কোনদিনই সে জীবনের ভারসাম্য খুঁজে পেত না। অস্বাস্থ্যের প্রবল যন্ত্রণার ভেতরে সে তার মানসিক স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করতে পেরেছে। মদকে তাই সে নমস্কার করে।

মদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকারের আর একটি কারণ আছে নীলাঞ্জনের। মদ তাকে দিয়েছে অনমনীয় সহনশীলতা। মদ থেকেই সে পেয়েছে অনুভূতির অহেতুক বন্ধন থেকে মুক্তির সন্ধান। যৌবনের ব্যর্থ প্রেম জীবনের শেষ নয়, সীতা থেকে শ্যামলী এই বন্ধুর পথ অতিক্রম করা নীলাঞ্জনের অসাধ্য হত যদি তা মদে পিচ্ছিল না হত। আজ মদের প্রয়োজন নেই। তাই আজ সুরার প্রবাহ থেকে সে সশ্রদ্ধ ব্যবধান রচনা করে নিয়েছে।

বাড়ি ছাড়ার সময় কিছু টাকা ছিল নীলাঞ্জনের বাক্সে। আর মধ্যবিত্ত বাঙালী সংসার থেকে পালিয়ে যাবার তাগিদও ছিল প্রবল। তাই সে মোটামুটি সস্তায়

একটা চিলে ঘরে আস্তানা নিল শহরের তথাকথিত সাহেবপাড়ায়।

এবার নীলাঞ্জন একেবারে হাত-পা ছাড়া মানুষ। এমন কি সীতার বন্ধনও আর নেই। অমিতাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার আর কেউ নেই। বাবা আর টাইপ করে চিঠি পাঠাবেন না তার ঘরে। মাকে রাত জেগে দরজা খুলে দিতে হবে না। দাদা-বৌদিদের অন্তর্যুদ্ধে তাকে বিপর্যস্ত হতে হবে না। যতদিন পকেটে পয়সা আছে হাত বাড়ালেই বন্ধু।

প্রথম রাতেই তার হোটেলের চিলে ঘরে একটা বিরাট মাইফেলের ব্যবস্থা হল। সন্ধ্যে হতে না হতেই নীলাঞ্জন টের পেল তার শেকল ছেঁড়ার বার্তা দিকে দিকে রটে গেছে। কেউ কেউ বোতল নিয়ে এসেছে। কেউ কেউ শুধু মুখের হাসি। কোন কোন বন্ধু আবার তাদের বন্ধুদের সঙ্গে করে এনেছে। এদের মধ্যে একজন বিলেতবাসী, যৌনলীলা আর ভারতীয় সমাজের কুশ্রীতা ফলাও করে বর্ণনা করে কয়েকটি তৃতীয় শ্রেণীর উপন্যাস লিখে কেউকেটা হয়েছেন। বেশ কয়েক পাত্র গেলার পর ঠিক করা হল সোনাগাছি যাওয়া হবে। ফ্রী স্কুল স্ট্রীট থেকে এক অনামিকাকে ধরে নিয়ে এসে একদিন নীলাঞ্জনের অসামান্য ক্ষতি হয়ে গিয়েছিল। আজ কিন্তু নীলাঞ্জন ঠিক করল সে যাবে। সোনাগাছিতে। বেশ্যাপল্লীর অভ্যন্তরীণ জগতের সঙ্গে কোনদিন তার পরিচয় হয়নি এর আগে।

ট্যাক্সি সেণ্ট্রাল অ্যাভিন্যুর পেট্রল পাম্পের পাশ দিয়ে ঢুকে গেল গলিঘুঁজির এক বিচিত্র পরিবেশে। একা সে পথ হারিয়ে ফেলত নিশ্চয়ই। আবার এলে তার অবস্থা পথহারা এক পথিকের মত হবে। যাক সঙ্গে আছে অভিজ্ঞ কয়েকজন। তাই যথাস্থানে পেঁছোতে বিশেষ অসুবিধে হল না। দু-একটা কথা বলার পর পিম্পরা সরে গেল। তারা সবাই ঢুকে পড়ল চারতলা একটা বাড়িতে। সেখানে নাকি চাঁদের হাট। নীচের তলায় ঢোকা মাত্র দেখল একটি সুন্দর মেয়ে একটি ছোট ঘরে যাচ্ছে। নীলাঞ্জনদের সবার বেশ নেশা হয়ে গেছে। পাতলা একটা শাড়ির নীচে মেয়েটির নধর শরীর দেখে ওদের রক্ত একটু গরম হল। হুড়মুড় করে ওরাও ঢুকে পড়ল এক চিলতে সেই ঘরটাতে। দেখল ওটা কলঘর। মেয়েটি পেছন ফিরে তাকিয়ে ওদের দেখে ফিক করে হেসে ফেলল। গলায় প্রস্রাবাগারের কড়া ঝাঁঝওয়ালা গন্ধের স্পর্শ লাগিয়ে বলল, "ওরে ও চাঁপা, এ বাবুরা আমার পেচ্ছাপ করা দেখতে চায় না কি রে?" নীলাঞ্জনের কাপ্তান সাগরেদরাও একটু ভড়কে গেল। ফাজিল ওই মেয়েটির মধ্যে নীলাঞ্জন একটা অনমনীয় প্রিন্সিপল আবিষ্কার করল সেদিন। শত পয়সা দেখিয়েও মেয়েটিকে রাজী করান গেল না ওদের ওর ঘরে বসতে দিতে। বাঁধা বাবু আসবে।

তারপর আর একটা ঘরে। সেখানে সালোয়ার কামিজ পরা এক অতি স্বাস্থ্যবতী মেয়ে রেডিওতে গান শুনছিল। ওদের মধ্যে একজনকে চিনতে পেরে চেঁচিয়ে উঠল। আরে মেরা দেবানন্দ, সেদিনের বাকী পয়সাটা বের কর তো। এর মধ্যে বোতল সোডা এসে গেল। নীলাঞ্জনের নেশা আরও বাড়তে লাগল। একজন জোয়ান মেয়েটিকে বলল, নীলাঞ্জন একটা কাগজের অফিসে কাজ করে। অমনি মেয়েটি তেরচা হয়ে বসে প্রোফাইল দেখিয়ে ওর বিশাল পা দুটো নাচাতে লাগল। বলল, "বাবু, ক্যালেণ্ডারে আমার ছবি ছেপে দেবে?" তারপরে সোজা এসে নীলাঞ্জনের পায়ে হাত দিয়ে সুড়সুড়ি দিতে শুরু করল। হঠাৎ রেগে গিয়ে

নীলাঞ্জন তড়াক করে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, অন্য কোথাও চল।

অবশেষে একটি ঘরে যাওয়া গেল যেখানে অধিবাসিনীর চাহিদা একটু কম। ওরা আরাম করে বসে আরও কিছু মদ ও সোডা আনল। তারপর একজন ফিস-ফিস করে মেয়েটিকে কি যেন বলল। সে খানিকক্ষণ আপত্তি করতে লাগল। তারপর রাজী হল। নীলাঞ্জন জিজ্ঞেস করল ব্যাপার কি? একজন বন্ধু বলল, গরম জিনিস ভাই। এবার স্ট্রিপটীজ দেখবে, তোমাদের প্যারিসকে হার মানিয়ে দেয়। নীলাঞ্জনের চোখে তখন ঘোর লেগেছে, বলল, হ্যাঙ্গ ইয়োর প্যারিস। বন্ধু। ওকে নাচতে বল, ঘুরে ফিরে। নাচো মেরা বুলবুল, পয়সা মিলে গা।

একটা নকল লজ্জা দেখিয়ে মেয়েটি তার স্বল্প বসনের শাসন থেকে নিজেকে মুক্ত করতে লাগল, আস্তে আস্তে যাতে দর্শকের উত্তেজনা বাড়ে। সব শাড়ি-জামা সে খুলল, কিন্তু একটা ব্যাপারে ওকে কিছুতেই রাজী করান গেল না। ব্রা সে খুলবে না। এক বিচিত্র দৃশ্য শুরু হল নীলাঞ্জনের চোখের সামনে। একটি মেয়ে নাচছে, নানা অঙ্গভঙ্গিতে নাচছে। উদম শরীর। শুধু বুকের ওপর এক চিলতে ব্রা বেমানানভাবে আঁটা রয়েছে। ভ্যানিটি জিনিসটা বেশ্যারও আছে। কেউ বোধ হয় ওকে বলেছে ওর বুকের বাঁধুনি আগের মত নেই। তাই কাঁচুলির বাঁধুনি ওর কাছে এতই দামী।

সে রাত্রে কি করে বাড়ি ফিরল নীলাঞ্জনের কিছুই মনে নেই। পরেরদিন সকালে দুটো আস্প্রো খাবার পর যখন কফির কাপ তুলতে গেল, গরম কফি ছলকে পড়ল ওর হাতে। ওর হাত তখন থর থর করে কাঁপছে। মন-মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে আছে। হিসেব করে দেখল গত রাত্রে তার শ'তিনেক টাকা বেরিয়ে গেছে। আপিস থেকে ডুব মারল। বিছানায় শুয়ে শুয়ে গত রাত্রের আমোদ আহ্লাদ নিয়ে ভাবতে লাগল। কি পেয়েছে তার হিসাব মিলাতে গিয়ে নিজের ওপর রাগ আরও বেড়ে যেতে লাগল।

এই দলবেঁধে সোনাগাছি যাওয়ার প্রবণতা নীলাঞ্জন কোনদিনই খুব ভাল বুঝতে পারে না। যারা পাকা শিকারী তারা একা যাওয়া-আসাই পছন্দ করে। তাদের তাগিদ আসে যোলআনা প্রবৃত্তির তাড়না থেকে। মদের নেশায় প্রস্তুতি তাদের প্রয়োজন হয় না। এ ধরনের বেশ্যাসক্তির তবুও মানে খুঁজে পাওয়া যায়। অবশ্য এদের মধ্যে যারা বিবাহিত তাদের কথা আলাদা। কেন যাও জিজ্ঞেস করলে তারা হয়তো বলবে বৈচিত্র্যের সন্ধানে। সেটা কিন্তু একদম বাজে কথা। সোনাগাছি বা হাড়কাটা লেনে যাদের নিত্য আনাগোনা তাদের কিছু চেনা মেয়েমানুষ থাকে। সেখানে গিয়ে তারা অভ্যস্তরীতিতে বসে, একই ধরনের কথাবার্তা বলে, কখনও বা তাও বলে না, মাঝে মাঝে মেয়েমানুষদের নিজস্ব অভাব অভিযোগ আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা শোনে, আর তারপর যে যে কাজে আসে সেটি করে নিয়ে বাড়ি ফিরে যায়। এতে বৈচিত্রই বা কোথায়, উত্তেজনাই বা কোথায়? এখানেও বিবাহিত অবিবাহিত নারীমাংস শিকারীরা সবাই অভ্যাসের দাস। কিন্তু নিজের ঘরের চাঁপার থেকে সোনাগাছির পাপিয়া কেন বেশী আকর্ষণীয়? সাহেব বিবি গোলামের ছোটবাবুর কথা মনে আসে। ওরা অনেক ছলাবলা জানে। উনবিংশ শতাব্দীতে হয় তো জানতো। আজকাল বেশ্যারা ব্যবসা বোঝে ভাল, প্রেম নিবেদনের আর্ট নিয়ে ওদের মাথাব্যথা তেমন নেই।

দোটানায় পড়ে শেষমেষ নীলাঞ্জন ওই পাড়ায় গিয়ে হাজির হয়েছে আরও কয়েকবার। প্রতিবারই তার পয়সা গচ্চা গেছে। একবার একটা বিচিত্র অভিজ্ঞতা হয়েছিল। সে আর তার অল্প পরিচিত এক বন্ধু বেশ রাত করে ঢু মেরেছিল সোনাগাছির সেই পূর্বপরিচিত বাড়িটিতে। উৎসাহ সঙ্গীটিরই বেশী ছিল। চারতলায় একটা ঘরে গিয়ে কিছু ওদের বন্ধুমহলের সাংকেতিক কথায় মাল্যপান করা হল। মেয়ে জড়ো হল দুটি—একটি প্রগলভা, আর একটি কেমন যেন আনমনা। সঙ্গী প্রগল্‌ভাটিকে নিয়ে একটি ঘরে চলে গেল। নীলাঞ্জন অপ্রস্তুতের মত বসে রইল অন্য মেয়েটির সঙ্গে। মেয়েটির মুখে কথা নেই। হঠাৎ উঠে গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ল আসঙ্গের ভঙ্গিতে। সরিয়ে ফেলল স্বল্পবাস। নীলাঞ্জন বলল, তার কিছু করার ইচ্ছে নেই। সে শুধু বসে দুটো কথা বলতে চায়। মেয়েটি ফুঁসিয়ে উঠল। নানাভাবে তাকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করতে লাগল। শেষে মরীয়া হয়ে তাকে পরখ করে দেখল। তারপর মেয়েটির কি রণরঙ্গিনী রূপ। ক্ষ্যাপার মত চ্যাঁচাতে লাগল, নিশ্চয়ই এর আগে অন্য কোন ঘরে গিয়েছিলে। আর কক্ষণও এ ঘরে আসবে না। এলে ঠেঙিয়ে বের করে দেব।

এই ঘটনাটা নীলাঞ্জনকে খুব বিচলিত করেছিল। আচ্ছা, ঐ মেয়েটা তার অপৌরুষে এত চটে গেল কেন? ওর সঙ্গে তো নেহাৎই দেনা-পাওনার সম্পর্ক। তাকে দেখতেও এমন কিছু লম্বা চওড়া পালোয়ানের মত নয় যে তাকে দেখেই ঐ বিশেষভাবে দগ্ধ মেয়েটি কামনায় আর্দ্র হয়ে উঠবে। তবে কেন এমন হল? এ প্রশ্নের উত্তর নীলাঞ্জন কোনদিন পায়নি:

আর একদিন দুপুরের দিকে কিছু বন্ধুর সঙ্গে নীলাঞ্জন ও পাড়ায় গিয়েছিল। এক বন্ধুর চেনা একটি মেয়ের ঘরে ওরা বসেছিল। মেয়েটির তখন হাতে অনেক সময়। সে বেশ কিছুক্ষণ বসে ওদের সঙ্গে গল্পগুজব করল, বিবস্ত্র হয়ে নাচ দেখাল, ওদের সঙ্গে মদও খেল খানিকটা। সাধারণত বেশ্যারা ব্যক্তিগত প্রশ্ন একেবারে সহ্য করতে পারে না। বিশেষ করে যখন তরুণ রোমান্টিক মূর্খের মত জিজ্ঞেস করে তুমি কেমন করে এ লাইনে এলে? প্রশ্নটা যে কত অবান্তর এবং অসমীচীন তা এদের মগজে ঢোকে না। ধরুন যদি মেয়েটি পাল্টা প্রশ্ন করে, তুমি কেমন করে লোহার ব্যবসায় ব্ল্যাক টাকা করলে? কিন্তু সেদিন বিকেলে ঐ মেয়েটির গল্প করার মুড এসেছিল। এটা সেটা বলার পর নীলাঞ্জন অত্যন্ত কুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞেস করেছিল মেয়েটিকে, "আচ্ছা তোমার ঘরের কোন অতিথির জন্যে তোমার কখনও খুব উত্তেজনা এসেছে?" মেয়েটি কিন্তু মুখ ঝামটা দেয়নি। খানিকটা ভেবে বলল, "একবার মনে পড়ে একজনের জন্যে"। নীলাঞ্জন বুঝল মাত্র একজন পুরুষই একটিবার ঐ মেয়েটির বহু ব্যবহৃত দেহে রোমাঞ্চ এনেছিল। কিন্তু কেন তার এমনটি হয়েছিল সে রাতে মেয়েটি মনে করতে পারল না। অন্য আর এক রাতের সেই প্রত্যাখ্যাতার রোষবৃষ্টির কারণ নীলাঞ্জন এই মেয়েটির কথায়ও খুঁজে পেল না।

দীর্ঘকাল মদের টেবিলে সময় কাটিয়ে নীলাঞ্জন একটা কথা বেশ ভালভাবে বুঝেছে। বোহিমিয়ান জগতেও মদ ও নারী দুটো জিনিসের মধ্যে বিরোধিতা রয়েছে। কলকাতার সমাজে আজকাল অনেক মেয়ে শখ করে মদের গেলাশে তাদের লিপস্টিকরঞ্জিত অধর ঠেকাতে শুরু করেছে। কিন্তু এখনও জিনিসটা তার

চোখে বেমানান ঠেকে। কোন বাঙালী মেয়েই তার স্বামী বা প্রণয়ীর প্রচুর মদ খাওয়া মনে প্রাণে সমর্থন করতে পারে না। তাদের মানসিক উদ্বেগ বা অসন্তোষ ঢাকবার জন্য হয় তারা অশোভন আচরণ করে কিংবা নিজেরাই বেসামাল হয়ে পড়ে।

অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে গিয়ে নীলাঞ্জনের পুঁজি নিঃশেষ হয়ে আসছিল। নতুন করে টাকা রোজগার করার ক্ষমতা কিংবা উৎসাহ দুটোর একটাও আর অবশিষ্ট ছিল না তার। রোজকার মদ জোগাড় করাই এক বিরাট সমস্যা হয়ে দেখা দিল। একদিন টালিগঞ্জের এক জায়গায় একটা দোকান থেকে দরজা বন্ধ হয়ে যাবার পর লুকিয়ে একটা বোতল কিনতে গিয়েছে। পাশেই বাংলা মদের দোকান। সংগী বলল, 'এ সব ট্যাঁশ ব্যাপারে আর থাকার কোন মানে হয় না। বাংলা মদের দলে চলে এস। পয়সারও সাশ্রয় হবে, আর স্বাস্থ্যটিও খারাপ হবে না।' নীলাঞ্জন জীবনে কোনদিন বাংলা মদ খায়নি। বলল, 'যা ; ভদ্রলোকে দিশী মদ খায় না কি আবার? কেমন ভোট্‌কা গন্ধ বলে শুনেছি।' বন্ধুটি বাংলা মদের সেবা করে আসছে দীর্ঘদিন ধরে, আদর করে তাকে বাংলু বলে ডাকে। বললে, 'যত সব ননসেন্স। বাংলা মদ একবার খেয়েই দেখ না। তারপর আর এই রাম, হুইস্কি খেতে মন চাইবে না। আগামী রোববার তোমায় একটা জায়গায় নিয়ে যাব বেলা বারোটা নাগাদ। সেখানে বিরাট আড্ডা জমে। ও জগতটা তোমার চেনা দরকার।'

পরের রোবরার নীলাঞ্জন গেল ওয়েলেসলি স্ট্রীটের প্রখ্যাত সেই শুঁড়ীখানায়। খালাসিটোলা বা সংক্ষেপে কে টি। বারোটার মধ্যেই অনেকে হাজির হয়েছে। কিছু কবি, কিছু কবিযশ-প্রার্থী আর কিছু স্রেফ পানরসিক। কবে কোন্‌কালে জানা যায় কয়েকজন লেখক এই খালাসিটোলায় মদের আসর জমান। সেই থেকে বাংলা সাহিত্যের সংগে খালাসিটোলার একটা অজ্ঞাত যোগসূত্র রচিত হয়ে গেছে। শুধু যাদের পকেট গড়ের মাঠ তারাই ওখানে যায় না। মাঝে মধ্যে প্রতিষ্ঠিত প্রবীণদেরও দেখা যায়। এ'দের মধ্যে একজন রোববারের আসরের মধ্যমণি। তাঁর উপস্থিতি অনেকের কাছে দু দণ্ডের মালটানার জন্য একটা ভাল অজুহাত। রোববার বেলা দশটা নাগাদ হয়তো চা খাচ্ছে কেউ বালিগঞ্জ কি শ্যামবাজারের চায়ের দোকানে। হঠাৎ রব ওঠে, চল যাওয়া যাক, অমুকদার সংগে দেখা করে আসি, সেই কবে দেখা হয়েছিল (খুব সম্ভবত আগের রোববারই)। দীর্ঘকালের মোদোদের মধ্যেও কেন জানি 'চল মদ খেতে যাই খালাসিটোলায়' এই কথা সাফ সাফ বলতে কেমন যেন সংকোচ হয়।

মদ খাবার আরামের জন্য খালাসিটোলা কাউকেই আকর্ষণ করবে না। এক-কালে হয়তো মোটর গ্যারেজ ছিল। মস্ত বড় টিনের ছাদওয়ালা একটা ঘর। বড় ঘরটায় সারি সারি বেঞ্চিপাতা। একদিকে একটা ছোট ঘর। সেখানে কাউন্টারে দিশী মদের বোতল বিক্রী হয়। পাঁইট, কিংবা বড় বোতল। সংগে সোডা, লেবু, নুন। কাউন্টারে দাঁড়িয়ে গলা ভেজান যায়। কিন্তু দীর্ঘ আড্ডা দিতে হলে বোতল-টোতল নিয়ে একটা বেঞ্চিতে আশ্রয় নাও। দোরগোড়ায় ছোট ছোট চিংড়ি মাছ ভাজা, ডিম ভাজা বিক্রী হয়। মালের সংগে ভাল জমে। কিন্তু কলেরার ভয় থাকলে ও-লাইনে না যাওয়াই ভাল। রোববার দিন সকালে নীলাঞ্জনের আড্ডায়

সবাই জমায়েত হত একটা বিশেষ বেঞ্চির চারধারে। সেখানে বসে থাকেন সেই মধ্যমণি। লেখক হিসেবে তিনি দলপতি কি না নীলাঞ্জন জানে না। কিন্তু রোববারের এই গলা ভেজানোর আসরে তাঁর আসন অবিসংবাদিত। একটা নাগাদ তিনি চলে যান। কিন্তু আসর তখন মোটে জমজমাট হতে শুরু করেছে। দু-একজন গান ধরেছে। একদিকে হয়তো একটা ঝগড়া হাতাহাতির পর্যায়ে পৌঁছোলো বলে। হঠাৎ একজন শুয়ে পড়ল। দু-তিন ঘণ্টা আর চোখ খুলবে না। বিকেল চারটে নাগাদ আসর ভাঙবে। কে কিভাবে কোথায় চলে যায় কারোরও মনে থাকবে না। আবার যুযুৎসুরা সমবেত না হওয়া পর্যন্ত জানার উপায় নেই সবাই অক্ষত শরীরে বাড়ি পৌঁছেছিল কি না আগের রোববার।

খালাসিটোলায় এই কয়েকটি তথাকথিত ভদ্র সন্তানের উপস্থিতি শুঁড়ীখানার আসল খদ্দেরদের চোখে কেমন ঠেকে নীলাঞ্জনের বড় জানতে কৌতূহল হোত। তাই সে ধীরে সুস্থে হপ্তার অন্য দিনগুলোতেও সন্ধ্যের দিকে সেই টিনের চালের আশ্রয়ে যাওয়া শুরু করল। সন্ধ্যে গভীর হলে খালাসিটোলার চেহারা অন্য রকম হয়ে যায়। সেখানে স্বেদের গন্ধ আর তখন ভদ্রসন্তানের অনভ্যাসজাত নয়। সন্ধ্যাবেলায় খালাসিটোলায় ঘামের গন্ধে তেলকালির মিশ্রণ থাকে। মেহনৎ করা মানুষের আত্ম-বিস্মৃতির সময় সেটা। কাউণ্টারের গা ঘেঁষে দু-একজন লোককে অবশ্য দেখা যায় যাদের খুঁটিয়ে দেখলে দূর অতীতের পালিশ চোখে পড়বে। ইংরেজিনবীশ মানুষগুলোর সর্বস্ব গেলেও বাচনভঙ্গীতে একটা বিশিষ্টতা থাকে। তাই হঠাৎ কোন এক সময় আছোলা দিশী খিস্তির চাপা গুঞ্জনের মধ্যে কয়েকটা ইংরেজী শব্দের ঢিল পড়লে চমকাবার কারণ নেই। অস্বস্তি পাবারও কিছু নেই। খানিকক্ষণ পরে দিশী সাহেবরা কোন্ ছার, সেই একটা কবিতার ভাষায় স্বয়ং ভগবান মদে চুর হয়ে যায়।

নীলাঞ্জন অবশ্য প্রধানত মদ খেতেই যেত। লেবুর রসে প্রথম গেলাসের দুর্গন্ধ মেরে নিয়ে তারপর চালিয়ে যেত অক্লেশে—পাঁইট দু-এক টানার পর ঝিম লাগত। তখন কি বা হাঁড়ি কি বা ডোম। একদিন পাশে বসে ছিল একজন বুড়ো মত লোক, গায়ে খাকি পোষাক। ওর দিকে লোকটা কেবল ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে। তারপর বলেই ফেলে, "নীলুবাবু না আমাদের?" নীলাঞ্জন আমতা আমতা করে বলে, 'তা আপনাকে তো ঠিক মনে করতে পারছি না। পাশের লোকটি বলে, আরে তোবা, তোবা। আমাকে আবার আপনি আপনি করছেন কেন বাবু। আমাকে মনে নেই? আমি ওমজাদ, সাহেবের ড্রাইভার ছিলাম।" একটু ভাবার পর মনে পড়ল, দীর্ঘকাল আগে নীলাঞ্জনের পিতৃদেবের সারথি ছিল এই পলিতকেশ বৃদ্ধ। বলল, "তুমি কেমন আছ ওমজাদ?" মনে মনে নীলাঞ্জন ভীষণ অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। হাজার হোক ওমজাদ ওদের বেতনভুক ড্রাইভার ছিল একদিন। ঠিক মদ্যপানের সহচর হিসেবে তাকে মানায় না। যাক, ওমজাদকে কিছু খাওয়ানো তার উচিত। পকেট হাতড়ে দেখল একটা ফাইলের পয়সা ওঠে কিনা। না, সেটুকু বদান্যতা দেখানর সামর্থ্যও তার নেই। ওমজাদ কিন্তু নির্বিকার চিত্তে খেয়ে চলেছে। শুধু জিজ্ঞেস করল একবার বাবা জীবিত আছেন কি না। নীলাঞ্জন বাবার মৃত্যুর কথা বলায় লোকটা শুধু মাথা নাড়ল, কিছু বলল না। নীলাঞ্জনের পাঁইট বোতল নিঃশেষিত-প্রায়। আরও খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। মাঝে

মাঝে দরজার দিকে তাকাচ্ছে, চেনাশোনা কেউ আসে কি না। হঠাৎ ওমজাদ আলি তার ন্যুব্জ দেহ যথাসম্ভব সটান করে বলল, "আজ চলি নীলুবাবু, আবার দেখা হবে।" ওমজাদ চলে গেল। হঠাৎ দোকানের মালিক এসে বসল তার পাশে। জিজ্ঞেস করল, "আপনার সঙ্গে ওমজাদ মিঞার আলাপ আছে জানতুম না। আমার পুরোনো খদ্দের।" একটা বেয়ারা এসে একটা আস্ত পাঁইট রাখল তার সামনে। নীলাঞ্জনকে কিছু জিজ্ঞেস করার সুযোগ না দিয়ে বলল, "খেয়ে নিন। ওমজাদ চাচা দাম দিয়ে গেছে।" নীলাঞ্জন চুপ করে রইল। গেলাসে মদ ঢালল।

বাড়ির পুরোনো ড্রাইভারের সঙ্গে একাসনে মদ্যপান করতে নীলাঞ্জনের অস্বস্তি হয়। অথচ কত দাগী আসামী, গুন্ডা বদমাইশের পাশে বসে নিঃসংকোচে মদ খেয়ে গেছে এতদিন। না, এই সাধারণ মানুষের সাধারণ পানশালায় তাদের মত বিত্তহীন ভদ্রলোকের প্রবেশ অনধিকার চর্চা। সাহিত্যসেবীদের বিলাসের সঙ্গে শ্রমজীবীর আত্মপ্রকাশ একেবারেই খাপ খায় না। সেই রাত্রেই নীলাঞ্জন খালাসিটোলাকে বিদায় জানাল।

(নীলাঞ্জন : স্মৃতিচারণ)

কোন এক ইংরেজী উপন্যাসে একটি চরিত্র দীর্ঘকাল জীবনের গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিয়েছিল একটি মেয়ের বাহুডোরে ধরা পড়ে। তারপরে তার জীবনের মূলমন্ত্র হয় মধ্যবিত্ত জীবনের প্রতীক সুখী গৃহকোণে একটা টবে পোঁতা অ্যাস্‌পিডিস্ট্রা গাছ জীইয়ে রাখা। নীলাঞ্জনের জীবনেও কি শেষ পর্যন্ত তাই হল?

ফেলে আসা দিনগুলোর দিকে তাকালে নীলাঞ্জনের কেমন আশ্চর্য লাগে। ফিরিঙ্গী হোটেল, পার্ক স্ট্রীটের বার, খালাসিটোলা, সোনাগাছি—এই সীমাবদ্ধ জগত থেকে দাম্পত্য জীবনের বিস্তৃত আঙিনায় বেরিয়ে আসতে নীলাঞ্জনের তেমন তো বেগ পেতে হয় নি। খালাসিটোলা, সোনাগাছি চংক্রমণে ক্লান্তি এসেছিল অনেকদিন ধরে। কিন্তু ক্লান্তি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার যে রাস্তাটা শেষ পর্যন্ত খুঁজে নিল সে, তার জন্য কোন প্রস্তুতিই তার ছিল না। বাবা তো মারা গেছেন অনেকদিন হলো, কিন্তু মা-ও হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন অনেকদিন। নীলুর বিয়ের ভাবনা তিনি আর ভাবতেন না। কিন্তু কেমন আকস্মিকভাবে সবকিছু ঘটে গেল। এবং সে কেমন নির্ভয়ে ছাদনাতলার দিকে এগিয়ে গেল।

অথচ প্রথম যৌবনে প্রেমে ব্যর্থতার পর এই বিয়ে জিনিষটা নিয়ে কত হাসাহাসিই না সে করেছে বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে। কেউ যদি বলত, এত মস্করা করছ আজ, একদিন তো নিজেই প্রেমরসে হাবুডুবু খেয়েছ। সে বলতো, যৌবনের প্রেম সে শৈশবের হাম রোগের মত, একবার না একবার হবেই, আবার সেরেও যায় ঠিক। কিন্তু বিয়ে, বি পূর্বক বহ্ ধাতু ঘঙ্ অর্থাৎ বিবাহ—সে পথে পা বাড়িও না বন্ধু।

বিয়ে সম্বন্ধে ঘেন্না ধরার মত অনেক কারণও ছিল নীলাঞ্জনের ক্ষেত্রে। নিজের জীবনে সে ঠিক কাঁকনপরা হাতের বাড়ি খায়নি কখনও। কিন্তু সে দেখেছে অনেক কিছু। বিদেশে তো বটেই। এক ইংরেজ বন্ধুর হৃদয় ভেঙে যেতে দেখেছে একটি স্থূলাঙ্গিনী অস্ট্রেলিয়ান রমণীর ছলনায়—তাকে তিন তিনটি

বছর নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে একটি অজ্ঞাতনামা পুরুষের হাতে হাত দিয়ে উধাও হয়ে যায় সেই হৃদয়হীনা। তার উচ্ছৃঙ্খলতার দিনেও চূড়ান্ত বিশ্বাস-ঘাতকতায় মর্মাহত হয়েছে সে। বন্ধুর বাগ্‌দত্তাকে সে স্বচক্ষে আরেক বন্ধুর অঙ্কশায়িনী অবস্থায় দেখতে পেয়ে মরমে মরেছে, মুখ ফুটে কিছু বলতে পারেনি।

অবশ্য সবচেয়ে বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা হয়েছিল তার একবার মুসৌরি গিয়ে। সেখানে একটা হোটেল মত আস্তানায় আশ্রয় নিয়েছিল। এমনিতে একাচোরা মানুষ। কিন্তু তখন সময়টা ছিল পৌষ মাঘ মাস। মুসৌরিতে কনকনে ঠাণ্ডা। বাইরে বেরোনো দায়। আর সারাক্ষণ ঘরে বসে মদ খাওয়া যায় না। নীলাঞ্জন তাই অনভ্যাস সত্ত্বেও হোটেলের অন্যান্য অতিথিদের সঙ্গে মেলামেশার চেষ্টা করল। একটি বাঙালী পরিবারের সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব জমল অল্প কয়েকদিনেই। স্বামী স্ত্রী আর একটি বাচ্চা।

বহুদিন ঘরছাড়া মানুষ নীলাঞ্জন। পরিবারের ঠাণ্ডা ছায়ার নীচে যে কত ময়লা জমে তার জানা থাকলেও অনেকদিন ধরে তা তার গায়ে লাগেনি। অল্প কিছুদিনের জন্য তাই একটি সুখী পরিবারের সংস্পর্শে এসে বেশ কাটছিল সময়টা। বাচ্চাটা হাসতো খিলখিল করে, নতুন ঘাড়দুলিয়ে নাচতে শিখেছে, নাচতোও যখন তখন। আধো আধো স্বরে ওকে তাতা বলে ডাকত। কেমন একটা মায়া পড়ে গেল বাচ্চাটার ওপর নীলাঞ্জনের। কারণে অকারণে সে বাচ্চাটাকে টেনে নিয়ে যেত নিজের ঘরে। অজ্ঞাতে টেবিলে রাখা মদের বোতলের দিকে হাত বাড়ানো তার কমে যেতে লাগল।

পরিতোষবাবু খুব অমায়িক ভদ্রলোক। জার্মানিতে হাতেকলমে যন্ত্রপাতির কাজ শিখে এসেছেন। বাবার টাকাকড়ি ছিল বেশ কিছু। খানিকটা মূলধন নিয়ে একটা ছোট কারখানা খুলেছিলেন বছর দশবারো আগে। আজ তাঁকে একটা ছোটখাটো শিল্পপতি বলা অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু বোলচাল নেই তেমন। কথায় কথায় বিকৃত উচ্চারণে ইংরেজির ফুলকি ছড়ান না। পারতপক্ষে বিদেশের গল্প করেন না। সব সময় মুখে একটা জ্বলন্ত চুরুট আর গায়ে একটা ফুল আঁকা ড্রেসিং গাউন, এই হোলো তাঁর সাচ্ছল্যের পরিচয়। কথা বলেন কম, হা হা করে হাসেন অনেক বেশী।

পরিতোষবাবু প্রথম যৌবনে কারখানার প্রেমে মনপ্রাণ সঁপেছিলেন। স্বভাবতই তার বিয়ে হয়েছে একটু বেশী বয়সে। খুব একটা বেশী না অবশ্য তার বয়স, বড় জোর পঁয়তাল্লিশ। আজকাল হামেশাই এমন হচ্ছে। সে তুলনায় সুমিত্রার বয়স বেশ কিছু কম। এখনও তার সারা অঙ্গে যৌবনের ঢল। অপূর্ব সুন্দরী মেয়ে। রঙটা মাজামাজা, বিয়ের বিজ্ঞাপনে যাকে বলা হয় উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। বাঙালী মেয়েদের পক্ষে দীর্ঘাঙ্গী, কিন্তু সবচেয়ে আকর্ষণীয় জিনিস চেহারায় ওর দুটি চোখ। কবির ভাষায় কত উপমা আছে ; সব কিছুই মানিয়ে যায়—মীনাক্ষী, এনাক্ষী, নীলোৎপল আঁখি সুমিত্রা। চোখ দুটোর দিকে নীলাঞ্জনের তাকাতে ভয় করত—এত গভীর সে চোখ, ওর ভয় হত ও ডুবে যাবে, আর নিজেকে তুলে আনতে পারবে না।

প্রথম আলাপ হয় সুমিত্রার সঙ্গেই। লালডিব্বার দিকে এগোবার ব্যর্থ চেষ্টা

করছিল একদিন। হঠাৎ জোর বৃষ্টি নামল। ছুটে গিয়ে ও একটা গাছের নীচে আশ্রয় নিল। দেখল বর্ষাতি গায়ে ছাতা মাথায় একটি অপরূপ সুন্দরী মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দ্বিতীয়বার চোখে চোখ পড়তে দেখল মেয়েটি ওর দিকে তাকিয়ে আছে কৌতূহলী দৃষ্টিতে। হঠাৎ মেয়েটিই কথা শুরু করল, বলল 'আপনি তো নীলাঞ্জন গুপ্ত। আমাদের হোটেলেই থাকেন।'

নীলাঞ্জন মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল, 'নামটাতো ঠিকই বললেন। কিন্তু আমার নামটাতো এমন বিখ্যাত কিছু নয় যে আপনার জানার কথা। আমায় চিনলেন কি করে বলুন তো?'

"আপনি তো প্রেসিডেন্সিতে ছিলেন, হিস্ট্রি অনার্স। চেহারাটা একটু পালটেছে, মোটা হয়েছেন, চুল পেকেছে, কিছু মনে করবেন না পাতলাও হয়েছে একটু, কিন্তু চিনতে আমার ভুল হয়নি।"

"আপনিও বুঝি প্রেসিডেন্সি। কোন্ বছরের?"

"আমি কিন্তু আপনার চেয়ে দু বছরের সীনিয়র ছিলাম। যাক আমরা একই হোটেলে, বেশ মজা হল। আমার নাম সুমিত্রা। আর আপনি তো আমার চেয়ে ছোট, আমি আপনাকে কিন্তু তুমি বলেই ডাকব।"

"বেশ তো। আমার নিজের কোন দিদি নেই। আপনি আজ থেকে আমার দিদি।"

হোটেলে ফিরে যেতে যেতে নীলাঞ্জনের মনে বহুদিন পরে একটা কবিতা লেখার ইচ্ছে হল। সুমিত্রার হাঁটার ঢং-এর মধ্যে ছন্দ আছে, ছন্দ আছে ওর হাসির কলরোলে। হাসলে ওর পুরন্ত গালদুটোতে সুন্দর টোপ পড়ে, ঢেউ ওঠে শরীরের নানান জায়গায়। নীলাঞ্জন পাশে হেঁটে চলা যুবতী দেহের আন্দোলন থেকে ওর অবাধ্য চোখ দুটো সরিয়ে নিল। দিদি বলে ফেলেছে যখন তখন কুচিন্তা মনে ঠাঁই দেওয়া যাবে না। নীলাঞ্জনের মধ্যে বরাবর এক ধরনের মধ্যবিত্ত রক্ষণশীলতা আছে।

হোটেলে ফিরে এলে সুমিত্রা নীলাঞ্জনকে সোজা টেনে নিয়ে গেল ওদের সুইটে। আলাপ করিয়ে দিল পরিতোষবাবুর সঙ্গে। শিল্পপতি পরিতোষবাবু মুখ থেকে চুরুটটা বের করে হা হা করে হেসে উঠলেন। বললেন—"আপনি যখন আমার বেটার হাফের ছোট ভাই তখন আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা তো খুবই মধুর। তোমাকে আমি শালাভাই বলে ডাকব। তুমি আমার থেকে বেশ কিছু ছোট হবে। তুমি বললাম বলে কিছু মনে করলে না তো।"

নীলাঞ্জন একটু হেসে বলল, "না বললেই আড়ষ্ট বোধ করতাম। তুমি যখন বলেছেনই পরিতোষদা, একটা চুরুট বের করুন তো। এই দারুণ শীতে বেশ জমবে।"

পরিতোষদা আবার অট্টহাস্য করলেন। সুমিত্রার দিকে তাকিয়ে বললেন, "বেশ একটি খরচে ভাই জোগাড় করেছ তো।" নীলাঞ্জনকে একটা চুরুট দিয়ে বাঁকা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, "তা চুরুট ছাড়া আর কিছু চলে নাকি? বলি সোমরসে মজেছ কোনদিন?"

নীলাঞ্জন একবার সুমিত্রার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলল, "ভয়ে বলব, না নির্ভয়ে বলব।"

পরিতোষদা বললেন, "আর কিছু বলতে হবে না, বুঝেছি। রোজ সন্ধ্যাবেলা এ ঘরে চলে আসবে। এক সঙ্গে একটু ফুর্তি করা যাবে।"

সুমিত্রা কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে উঠে গেল। একটু পরে একটা ফুটফুটে বাচ্চা কোলে নিয়ে এসে বলল, "এই আমার মেয়ে। দেখ তোমাকে দেখে হাসছে।"

নীলাঞ্জন বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে বলল, "কি নাম তোমার?"

সুমিত্রা মুখ ভেঙচালো। বলল, "আহা কি কথার ছিরি। ওকি নিজের নাম বলতে পারে নাকি? মোটে দেড় বছর বয়স। তাই না সোনা।"

নীলাঞ্জন একটু বিব্রত হয়ে বলল, "তা ওকে একটা কিছু বলে ডাকতে হবে তো। কি নাম দিয়েছ ওর।"

সুমিত্রা বলল, "সংঘমিত্রা। সুমিত্রার মেয়ে সংঘমিত্রা।"

নীলাঞ্জন বলে, "দেখো আবার দিদি! সন্ন্যেসিনী না হয়ে যায় তোমার মেয়ে!"

একটু পরে আবার সন্ধ্যেবেলা দেখা হবে বলে নীলাঞ্জন ওদের ঘর থেকে বেরিয়ে এল। নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে এক পেগ হুইস্কি নিয়ে ভাবতে বসল। বেশ আছে সুমিত্রারা ;—স্বামী, স্ত্রী, শিশুকন্যা, অর্থ, প্রতিপত্তি। পরিতোষ-বাবুর সন্ধ্যের দিকে দু-এক পেগ চলে এও বোঝা যাচ্ছে। সীতার কথা হঠাৎ মনে আসে। তারপর ঢক করে গেলাসের সালসাটুকু গিলে ফেলে। দুত্তোর, পরের কথা ভেবে কি হবে। মৃতসঞ্জীবনী সুধা কাছে থাকতে আর কিছুর নাহি প্রয়োজন। এবেলা বেশী খাবে না ভেবেছিল। একটু সময় দ্বিধা এল। তারপর নিজের মনে বিড়বিড় করল, মাধবী দ্বিধা কেন। আর এক পাত্র ঢেলে নিল। যতক্ষণ না বেয়ারা ঘরে দুপুরের খাবার নিয়ে আসে ততক্ষণ কিছু না কিছু করা চাই।

এরপর থেকে রোজ সন্ধ্যায় নীলাঞ্জন পরিতোষবাবুর সুইটে গিয়ে বসত। দুজনে মিলে মদ খেত। পরিতোষবাবু নীলাঞ্জনকে মাঝে মাঝে বলত, "ও রকম পড়ি কি মরি করে কি কেউ সুধাপান করে শালাভাই? জীবনের বেশীরভাগটাই তো পড়ে আছে। সব খাওয়া এত তাড়াতাড়ি শেষ করে ফেললে তারপর করবে কি? নাকি তুমি 'ধম্মদা রক্ত' বলার জন্য তৈরি হচ্ছো?"

নীলাঞ্জন অপ্রস্তুতের হাসি হাসে। বলে, "কেমন যেন অভ্যেস হয়ে গেছে পরিতোষদা। ধীরে সুস্থে খাওয়ার ধৈর্য আমার আর নেই।"

সীতার মৃত্যুর পর নিজের মানসিক বিপর্যয়ের কথা কোনদিন নীলাঞ্জন কারও কাছে খুলে বলেনি। কেমন যেন একটা সংকোচে তার জিভ আড়ষ্ট হয়ে যায়। আভাসে ইঙ্গিতে পরিতোষদাকে বলার চেষ্টা করেছে। পরিতোষদা ওকে থামিয়ে দিয়েছে। বলেছে, "শালাভাই, মদের ঘোরে কখনও এমন কোন কথা বলতে নেই যার জন্য অস্বস্তি পাবে।"

পরিতোষদার সঙ্গে গল্প করার একটা আলাদা স্বাদ আছে। ভদ্রলোক এমনিতে নিজেকে মিস্ত্রি বলে পরিচয় দেন, কিন্তু প্রচুর পড়াশোনা আছে তার। আর নীলাঞ্জনের সঙ্গে তার রুচির অদ্ভুত মিল। প্রথমদিন তার অগোছাল ঘরে ঢুকে চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে তিনি বলেছিলেন, "ইজ দিস অ্যাবসল্যুটলি হোয়্যার ইউ লিভ মাই ডিয়ার?" সুমিত্রা না বুঝে হেসেছিল ; নীলাঞ্জন বুঝে। অদ্ভুত তীক্ষ্নদৃষ্টি পরিতোষদার। বললেন, "আজকালকার ছেলেছোকরারাও গ্রেট গ্যাট্-

সবি পড়ে দেখছি। বড় আনন্দ হল।"

মাঝে মাঝে ওরা কে কি সিনেমা দেখেছে তা নিয়ে গল্পে মশগুল হয়ে যেত। সুমিত্রা দিনে দিনে ওদের আড্ডায় কেমন যেন মনমরা হয়ে পড়ছিল। একদিন নীলাঞ্জন বলেই ফেলে, "আচ্ছা দিদি, আমরা এত বকে যাই, তুমি একটাও কথা বল না কেন?"

সুমিত্রা মুখ বেঁকিয়ে হাসে। বলে, "কি করে বলব বল ভাই। আমার পেটে তো আর তোমাদের মত কারণসুধা পড়ে না!"

অবশেষে ওদের কলকাতা ফিরে যাবার সময় এগিয়ে এল। আসার আগের দিন সন্ধ্যেবেলা নীলাঞ্জন পরিতোষদার ঘরে ঢুকেছে। দেখে একটা ডিভানে উনি চোখ বুজে পড়ে আছেন। একবার দেখেই ও বুঝতে পারে পরিতোষদার পানের পরিমাণ আজ মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। কাল সকালের আগে উনি আর মুখ খুলবেন না।

সুমিত্রা জানালা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিল। বাইরে দেখার তেমন কিছু ছিল না। জমাট অন্ধকার। আকাশে তারা দেখা যাচ্ছে না।

নীলাঞ্জন মৃদুস্বরে ডাকল, "দিদি।"

সুমিত্রা হঠাৎ যেন ঘুম থেকে জেগে উঠল। ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, "ও তুমি। তা তোমার দাদা তো আজ আর তোমার সঙ্গে গল্প করতে পারবেন না।"

নীলাঞ্জন বলে, "তাতে কি হয়েছে। তুমি তো আছ। আজ তোমার সঙ্গে গল্প করি।"

সুমিত্রা বিষণ্ণ হাসি হাসে। বলে, "কিন্তু আমি তো ভাই তোমার সঙ্গে গেলাসে গেলাস ঠুকতে পারব না।"

নীলাঞ্জন বলল, "তুমি কোনদিন এ জিনিসটা চেখে দেখনি? অল্প একটু খেলে মনটা দেখবে কেমন চনচন করে উঠবে। একটু খেলে ক্ষতি কি?"

সুমিত্রা বলল, "কখনও চেখে দেখিনি বললে মিথ্যে কথা বলা হবে, কিন্তু আজ থাক। তুমি খাও। আমি এমনি তোমার সঙ্গে গল্প করব।"

নীলাঞ্জন এমনিতে মেয়েদের সঙ্গে গল্প করার ব্যাপারে খুব পারদর্শী নয়। কিন্তু কেন জানি সুমিত্রার সঙ্গে আড্ডা দিতে ওর সংকোচ হত না। ওর দীঘল চোখের স্নিগ্ধতা সব আড়ষ্টতা দূর করে দিত। সুমিত্রা ওকে ওর বাড়ির লোকদের কথা জিজ্ঞেস করে। নীলাঞ্জন অনেক কথা বলে, কিন্তু ওর মনে হয় কিছুই বলা হল না। বাবার কথা, বৃদ্ধা মার কথা, দাদা বৌদিদের কথা, সংসারের সুখ-দুঃখের কথা, ভগ্নপ্রায় যৌথ পরিবারের কুশ্রীতার কথা। সুমিত্রা বলে, "আজকাল যৌথ পরিবার ভেঙে যাচ্ছে তার একটা বড় কারণ আমার কি মনে হয় জান? ভালবাসা নেই, কিন্তু সহবাস আছে বলে। আমাদের ছোটবেলায় দেখেছি বাবা কাকা জ্যাঠারা যে যাঁর বাড়িতে থাকতেন, কখনও কখনও তাঁদের কর্মস্থল দেশের নানা জায়গায় ছড়ান থাকত, পুজোর সময় একটা ফ্যামিলি রিইউনিয়ন হত। সে এক সরগরম ব্যাপার। কত আনন্দ, কত উৎসব। আজকাল পৈত্রিক বাড়িতে সবাই তাদের ছোট ছোট স্বতন্ত্র সংসার নিয়ে এক সঙ্গে অথচ আলাদা আলাদা থাকার চেষ্টা করে। তাতে হয় তো সাশ্রয় হয়, কিন্তু সম্প্রীতি থাকতে পারে না।"

কথাটা বলে সুমিত্রা খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকে। নীলাঞ্জন বোঝে ও তার

নিজের কথা ভাবছে। তারপর সুমিত্রা চোখে বিদ্যুৎ খেলিয়ে জিজ্ঞেস করে, "তা তুমি বিয়ে করবে কবে? কোন বন্ধুটন্ধু আছে না কি?"

নীলাঞ্জন বলে, "ছিল, আজ নেই। বিয়ের কোন ইচ্ছে আপাতত নেই আমার।"

সুমিত্রা অল্প হাসে। বলে, "শেষ পর্যন্ত সব ঠিক হয়ে যায়। মানুষ স্মৃতি নিয়ে বাঁচতে পারে না। আমি বলছি তুমিও একদিন একটা মিষ্টি মেয়ের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধবে।"

নীলাঞ্জন ওর কথা হেসে উড়িয়ে দেয়। তারপর একটু গম্ভীর হয়ে বলে, "আচ্ছা দিদি, পরিতোষদা তো সাধারণত মদ খেয়ে বেসামাল হন না। আমাকেও মাঝে মাঝে লেকচার দেন এবিষয়ে। আজ ওঁর এমন হল কি করে?"

সুমিত্রা বলে, "এ নতুন কিছু নয়। মাঝে মাঝে হয়। তুমি আর তোমার পরিতোষদার কতটুকু জানো।"

তারপর হঠাৎ সুমিত্রা বলে বসে, "তোমার তো লেখার হাত আছে শুনেছি। আচ্ছা, তুমি আমাকে নিয়ে গল্প লিখবে একটা। সেই রবি ঠাকুরের সাধারণ মেয়ের মত শোনাচ্ছে, না?"

নীলাঞ্জন বলে, "গল্প লিখতে পারি কিনা জানি না। কিন্তু তোমাকে জানতে খুব ইচ্ছে হয়। বল না তোমাদের কথা। অবশ্য আপত্তি যদি কিছু না থাকে!"

সুমিত্রা বলে, "অনেকদিন কাউকে বলার জন্য হাঁসফাঁস করেছি। কিন্তু মনের মত শ্রোতা পাইনি। আজ তোমাকে বলব। শুনে হয়তো আশ্চর্য হবে, কিন্তু বিশ্বাস কর বানিয়ে বলছি না একটুও।"

সুমিত্রার কাহিনী রবীন্দ্রনাথের সাধারণ মেয়ের কল্পিত জীবননাট্য নয়। বড় বেশী গদ্যময় তার কাহিনী, বড়ই কঠিন আর ছন্দবিহীন। গোড়ায় অবশ্য সব কিছুই খুব মামুলি ব্যাপার। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে, সৌন্দর্যের জন্য খ্যাতি, বিয়ে হল একজন ধনী শিল্পপতির সঙ্গে। বয়সে পরিতোষ চক্রবর্তী তার থেকে বেশ কয়েক বছরের বড়। কিন্তু শক্ত সমর্থ চেহারা, মাথায় ঘন চুল। তাই বিয়ের প্রথম বছর সুমিত্রার মনে কোন ক্ষোভ ছিল না। জীবনে সচ্ছলতা যে কি আনন্দ দিতে পারে সুমিত্রা তার পরিচয় পেল। স্বাদ পেল একটি বলিষ্ঠ পুরুষের দেহের স্পর্শের উন্মাদনার। তখন দিনগুলো সবই মনে হত নানা রঙের।

তারপর অকস্মাৎ সব কিছু বদলে গেল। সবকিছু দেখতে না দেখতে বিবর্ণ হতে শুরু করল। প্রথম প্রথম সুমিত্রা কিছুই বুঝতে পারত না। কেন যে পরিতোষ দিনে দিনে বদলে যাচ্ছে। মদ পরিতোষ আগেও অল্পবিস্তর খেত, কিন্তু হঠাৎ যেন পরিমাণটা বাড়তে শুরু করল। আর শুরু হল এক ধরনের অভিব্যক্তিহীন ঔদাসীন্য। শেষে একদিন সুমিত্রা পরিতোষের সঙ্গে একটা খোলাখুলি আলোচনার জন্য নিজেকে তৈরি করে নিল।

পরিতোষ বাড়ি ফিরল সেদিন রাত করে। স্খলিত পায়ে। শব্দ শুনেই সুমিত্রা টের পেল আজ বেশ কয়েক পেগ টেনে এসেছে পরিতোষ। কেন এমন হল? কি ওর গোপন কথা? সুমিত্রা এটুকু বোঝে যে শুধু বড়মানুষী দেখানর জন্য পরিতোষ মদ খায় না। কিছু একটা হয়েছে। যাক সে সোজা চলে গেল পরিতোষের ঘরে। গিয়ে জোর গলায় বলল, "আজ ক'দিন ধরে এসব কি শুরু করেছ?"

পরিতোষ জড়িত গলায় বলল, "কেন, তুমি কি কচি খুকী নাকি? আমি মদ খাই এটা বুঝতে পার না?"

"কিন্তু কেন খাও—"

"ইচ্ছে করে বলে।"

"বাজে কথা বোলো না। আজ তোমাকে বলতেই হবে তোমার কি হয়েছে। কেন তুমি আমার সঙ্গে এ রকম করছ কদিন ধরে।"

"তোমার যা ইচ্ছে করতে পার। আমি পারি না।"

দুজনের গলা উঁচু হল, নীচু হল, হঠাৎ কি হয়ে গেল। বহুদিন যে বিষয়ে সতর্কতা নিয়ে এসেছে দুজনে তা কুটোর মত ভেসে গেল। সন্দেহ, সংশয় আর দ্বন্দ্বের আবর্তের মধ্যে একটি নতুন প্রাণের সৃষ্টি হল।

কিন্তু সে শুধু কামনাতপ্ত একটি রাত। ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস ওদের কাছে শান্তির স্নিগ্ধতা বয়ে আনল না। আবার ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হল।

আস্তে আস্তে ব্যাপারটা পরিষ্কার হতে লাগল সুমিত্রার কাছে। পরিতোষের ভেতরটা কীটদষ্ট হয়ে গেছে। সন্দেহের কীট, অহেতুক সন্দেহের কীট। তার মনে অজ্ঞাতে একটা ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে সুমিত্রা তাকে নিয়ে খুশী নয়, সে ব্যভিচারিণী। সন্দেহের ন্যূনতম ভিত্তি না থাকলে তা মন থেকে সরানো বড় কঠিন। এরই মধ্যে সংঘমিত্রার জন্ম হল। কিন্তু পরিতোষ বদলালো না। বাইরের পৃথিবীর চোখে তারা সুখী দম্পতির ভূমিকায় অভিনয় করে যায়। দিনের পর দিন। ভেতরের মানুষ দুটোর মধ্যে আজ যোজন যোজন ব্যবধান, দেহে ও মনে।

অবাক হয়ে সুমিত্রার কাহিনী শোনে নীলাঞ্জন। মনে মনে আওড়ায়, ওগো ক্লান্ত মেয়ে। তার নিজের চোখেও ক্লান্তি নেমে আসে। গেলাসটা নামিয়ে রেখে কোন কথা না বলে নিজের ঘরে চলে আসে। সুমিত্রার নিঃসঙ্গতায় সে আর অনধিকার প্রবেশ করতে চায় না কয়েকটা ছেঁদো কথার জাল ফেলে।

৮

আজ নীলাঞ্জন জানে সুমিত্রাই ঠিক বলেছিল। শেষ পর্যন্ত বিয়ে তাকে করতে হল। স্বেচ্ছায়। ঠিক কখন কিভাবে তার জীবনের মোড় ফিরে গেল তা নীলাঞ্জন এখনও সঠিক জানে না। তবে সে ভাববার চেষ্টা করে দেখেছে। একটা জিনিস আজ তার কাছে মোটামুটি পরিষ্কার। অভিজ্ঞতা থেকে শেখা, সেটা শুধু ছোটোখাটো ব্যাপারেই সম্ভব। খুব বড় বড় সিদ্ধান্তগুলো নেবার সময় মানুষ গতানুগতিকতার দাস। যেমন, লোকের মুখে শুনে কিংবা বই পড়ে সবাই অল্পবিস্তর জানে প্রেম বস্তুটা কি অনিশ্চয়তায় ভরা। তবুও মানুষ প্রেমে পড়ে। কখনও কখনও বারবার। বিয়েটাও তেমনি, আর প্রেমঘটিত বিবাহ তো বটেই। নীলাঞ্জনের বিয়েকে নিশ্চয়ই প্রেমঘটিত বিবাহ বলা চলে। কিন্তু নীলাঞ্জন ঠিক বলতে পারবে না কবে সে শ্যামলীর প্রেমে পড়েছিল। প্রেম তার জীবনে হঠাৎ এসে গেল, তাকে প্রেমে পড়তে হয়নি।

ক্লান্তি এসেছিল অনেকদিন ধরেই। দিনের পর দিন এক নাগাড়ে মদ খেয়ে যাওয়ার একটা বৈচিত্র্যহীনতা আছে। শরীরে কুলোয় না, মনও তেমন ভরে না। জীবন ধারণের জন্য কিছু পয়সারও প্রয়োজন, মদ কেনার জন্য তো বটেই। উত্তর তিরিশে নীলাঞ্জন আর একটা জিনিস আবিষ্কার করল। তার পরিচিত বন্ধু-বান্ধবেরা সবাই এক ধরনের দুমুখো জীবন যাপন করে। তাদের মধ্যে অধিকাংশই বিবাহিত। দিনের বেশিরভাগ সময়টা তারা পারিবারিক জীবনে ও কর্মক্ষেত্রে খুব হিসেবী থাকে, সন্ধ্যের দিকে শখ করে খানিকটা উদ্দাম হয়। সেই উদ্দামতার অন্তরালেও একটা হিসেবী মন কাজ করে। একজন সুরা সহ-চরের কথা মনে পড়ে যে বাড়িতে চুটিয়ে সংসার করত। অফিসে সে ছিল পুরোদস্তুর অফিসার। সন্ধ্যাবেলায় স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও একটি মেয়ের সংগে সম্পর্ক পাতিয়েছিল, মাঝে মাঝে সোনাগাছিতে যাবার অভ্যেস ছিল, অথচ বাড়িতে কাউকে খেতে নেমন্তন্ন করার সময় তার টেবল ম্যানার্স নিয়ে সে মাথা ঘামাত। ষোল আনা সমাজবিশ্লিষ্ট মানুষ সংসারে খুব কমই আছে। বেশিরভাগ লোকের আদৌ সমাজবিশ্লিষ্ট হবার ইচ্ছে নেই। আর এমন কি মোদো-মাতালদের আড্ডায়ও সমাজবিশ্লিষ্ট লোক খুব একটা পাত্তা পায় না।

মোট কথা মদের আড্ডা বেশ ক'দিন ধরেই নীলাঞ্জনের খুব অপ্রীতিকর লাগতে শুরু করেছিল। নতুন কিছুর আস্বাদের জন্য তার মন উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ভরসা ছিল না খুব। বয়স হয়ে গেছে। শরীরে ভাঙন ধরেছে। তাছাড়া জীবনে নতুন অভিজ্ঞতা আর কিই বা হতে পারে। সবই তো বস্তাপচা,

বাসী। তখনও সে বুঝতে পারেনি যে পুরোনো মদ নতুন বোতলে পরিবেশণ করলে তার স্বাদ পাল্টে যায়। নরনারীর সম্পর্কেও কথাটা সত্যি। বিশেষ করে যদি দেহের উত্তাপ মাদকতা ছড়ায়।

মদ, শুধু মদ আর আনুষঙ্গিক যন্ত্রণায় যখন অস্থির হয়ে উঠত নীলাঞ্জন তখন সে মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ত। শহর থেকে দূরে। ঠিক গ্রামে গিয়ে চাষীদের সঙ্গে মিলেমিশে লংকা মেখে পান্তাভাত খাবার রোম্যান্টিকতা তার যুক্তিবাদী মনকে আকর্ষণ করত না। কিন্তু শহরতলি কিংবা মহকুমা শহর তার খুবই ভাল লাগে। দীর্ঘকাল অনাচারের ফলে তার পুঁজি শেষ হয়ে এসেছিল—শৈলাবাসে গিয়ে বিলেতের আমেজ উপভোগ করার সামর্থ্য আর তার বিশেষ ছিল না।

শ্যামলীর সঙ্গে তার প্রথম দেখা শীতের গোড়ায় কুচবিহার শহরে। খুবই ক্লান্ত শরীর আর ক্লান্ত মন নিয়ে নীলাঞ্জন কুচবিহার গিয়েছিল। স্টেশন থেকে নামামাত্র ওর মনটা জিরিয়ে গেল। রিকশা করে স্টেশন থেকে যেতে যেতে চার-দিকের ফাঁকা মাঠ আর ছোট ছোট চালাঘরগুলো দেখলে কলকাতার সব গ্লানি নিমেষে উবে যায়। তারপর শহরের পিচঢালা রাস্তাগুলো—শোনা যায় আগে আরও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু এখনও ছবির মত সাজানো। তার ওপর আছে রাজপ্রাসাদ—বাঙালী সামন্ততন্ত্রের অতীত গৌরব।

একটা ছোটখাটো লেখার কাজ নিয়ে গিয়েছিল নীলাঞ্জন। এই রকম কাজ করেই তখন কায়ক্লেশে ভাত কাপড় আর মদ জুটোনোর পয়সা উপার্জন করত সে। সেই কাজের সূত্রে স্থানীয় এক উকীল ভবতোষবাবুর বাড়িতে গেল। ভবতোষবাবুর বয়স হয়েছে, কিন্তু অনেক পুরোনো পুঁথি আর ছবি সংগ্রহের নেশা তাঁর। নীলাঞ্জনও তখন ঐ বিষয় নিয়ে একটা সাময়িক পত্রে লেখার চেষ্টা করছিল। প্রথম দিন দুপুরে গিয়ে কড়া নাড়লে একটি ছোট ছেলে বেয়াদপি হাসি হেসে বলল, "এই ভরদুপুরে কড়া নাড়ছেন কেন? কাকে চাই? সবাই ঘুমোচ্ছে।" নীলাঞ্জন ভবতোষবাবুর নাম করলে সে বলল, "দাদু এখন নাক ডাকিয়ে ঘুম দিচ্ছে। মা, মাসী, দিদু সবাই ঘুমোচ্ছে। যান যান, সন্ধ্যাবেলা আসবেন।"

বাচ্চা ছেলেটির বখামিতে নীলাঞ্জন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল। এমনিতেই দুপুরের দিকে তার শরীরটা ম্যাজম্যাজ করে, ভবতোষবাবুর সঙ্গে দেখা করতে হবে বলে লাঞ্চে এক পাত্রও গলায় নামাতে পারেনি। হন হন করে সে তার হোটেলে ফিরে এল। ভাবল আর কখনও ও-বাড়ির মুখো হবে না।

কিন্তু পরপর দুদিন একা থাকার পর সন্ধ্যেবেলায় তার খুব কথা বলার ইচ্ছা হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত আর একবার ভবতোষবাবুর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করবে ঠিক করল। ওদের বাড়ীতে যখন গিয়ে পেঁছোল সূর্য তখন পাটে নামে।

ভয়ে কড়া নাড়তে যাচ্ছে এমন সময় কানে এল শাঁখ বাজার শব্দ। বহুদিন পর এ শব্দটা শুনল সে। সন্ধ্যায় যে তল্লাটে সে বেশীর ভাগ সময় ঘোরাফেরা করে সেখানে কেউ শাঁখ বাজায় না।

কড়া নাড়বার আগেই হঠাৎ দরজা খুলে একটি মেয়ে বেরিয়ে এল। আলো অন্ধকারে নীলাঞ্জনের চোখে পড়ল শুধু একরাশ কালো চুলের বন্যা। একটা

সস্তা তাঁতের শাড়ির আঁচল ভেদ করে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এক মুহূর্তের জন্য মোহাবিষ্ট নীলাঞ্জন অন্য একটা জগতে চলে গেল। যেন ভূত দেখেছে। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যই। বাস্তব আবার সামনে এসে দাঁড়াল। মিষ্টি গলায় কটি কথা বলল মেয়েটি। মামুলি কথা। সে কাকে চায় এই প্রশ্ন। বাস্তবকে আর এড়ান যায় না। যদিও আবেশের সৌরভে মন তখনও আচ্ছন্ন, শেষ পর্যন্ত বাস্তব জিতল। কাঁপা কাঁপা গলায় সে বলল সে একটা পত্রিকা থেকে এসেছে। ভবতোষবাবুর সঙ্গে দু-চার মিনিট কথা বলতে চায়।

বেশ ক বছর ধরে নীলাঞ্জন মেয়েদের এড়িয়ে চলেছে। শুধু তার দার্শনিক বৈরাগ্যের জন্য নয়। সে জানে আজকাল তার চেহারা কংকালের মত হয়ে গেছে। দু-এক পেগ না খেলে তার বিবর্ণ হাত দুটো অস্বাভাবিক কাঁপে। রাস্তায় বহুবার মুখ থুবড়ে পড়ার ফলে তার মুখটা খানিকটা রিলিফ ম্যাপের মত দেখতে লাগে। বয়স একেবারে কম নয়। কিন্তু তাই বলে বুড়ো থুড়থুড়ে সে নয়। তাই মেয়েদের তার সম্বন্ধে স্বাভাবিক নিস্পৃহতায় তার একটু হীনমন্যতা-বোধ এসে গেছে। এর চেয়ে মেয়েদের থেকে দূরে থাকা তার কাছে বেশী সম্মানজনক মনে হয়।

সেদিন সন্ধ্যায় পুরোনো পুঁথি সম্বন্ধে তথ্য জোগাড় করতে এসে একটি মেয়ের মুখোমুখি হয়ে পড়ায় নীলাঞ্জন খুব বিব্রত বোধ করছিল। কিন্তু এক মিনিটের মধ্যে তাকে বিব্রতর থেকে অবাক হতে হল বেশী। দেখল মেয়েটি কেমন স্নিগ্ধ চোখে তার দিকে তাকিয়ে আছে। সে প্রাণপণে মনে সাহস আনবার চেষ্টা করল, শুকনো হাসি হাসল একটু। তাকে কেমন দেখাচ্ছিল জানে না। কিন্তু মেয়েটি খুব মিষ্টি করে হেসে বলল, "আপনি ভেতরে এসে বসুন। আমি বাবাকে ডেকে আনছি।"

নীলাঞ্জন ভেতরে ঢুকে একটা তক্তপোষের ওপর বসে পড়ল। তাহলে এই মেয়েটি ওই বেয়াদপ ছেলেটির মাসী, কাল দুপুরে ও ঘুমোচ্ছিল। ঘুমোলে ওকে কেমন দেখায় ভাববার চেষ্টা করল সে এক মিনিট। তারপর ভীরু ভাবনাটা মন থেকে সরিয়ে ফেলল। মনে মনে ভবতোষবাবুকে কি প্রশ্ন করা যায় তাই ঠিক করার চেষ্টা করল। কিন্তু বারবার এই খানিকক্ষণ আগে দেখা মেয়েটির মুখটা এসে তার সব প্রশ্ন এলোমেলো করে দেয়।

বিদ্যাসাগরী চটিপায়ে ভবতোষবাবু এসে গেলেন। দু একটি মামুলি কথা বলার পর তিনি তাঁর সংগ্রহ নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। কয়েক মিনিট কথা বলতে এসে পাক্কা এক ঘণ্টা বসে রইল নীলাঞ্জন। একটি পলিতকেশ বৃধ একটা নিরীহ নেশা নিয়ে কি আত্মহারা হয়ে যেতে পারেন। নীলাঞ্জনের মনে হল সে যেন একরকম অনধিকার চর্চা করছে। পত্রিকার পাতায় দুচারটি কথা সাজিয়েই সে খালাশ। তার অনুরাগ তো কয়েকটি কাগজের টুকরোয় যার বিনিময়ে বোতল-ভরা গরল মিলবে। আর এই ভদ্রলোক বছরের পর বছর একই জিনিষ নিয়ে মগ্ন হয়ে আছেন। টাকা উপার্জন করার ধান্দা খোঁজা দূরের কথা, কষ্টার্জিত টাকা বিনাদ্বিধায় ঢেলে যাচ্ছেন কিছু পোকায় কাটা কাগজের বাণ্ডিল জোগাড় করতে। কিই বা প্রশ্ন করবে সে এই নিঃস্বার্থ অনুরাগীকে।

তাদের কথা বলার ফাঁকে এলোকেশী মেয়েটি এক থালা মিষ্টি আর এক

কাপ চা নিঃশব্দে রেখে গেছে তার সামনে। একটিও কথা বলেনি, এমন কি তার স্নিগ্ধ হাসিটাও আর দেখা যায়নি। অন্যমনস্ক নীলাঞ্জনের কানে এসেছে শুধু কয়েকগাছি কাঁচের চুড়ির টুংটাং। সে মনে মনে একটু হতাশ হয়। ভবতোষবাবু তাঁর কথায় এতই ডুবে গেছেন যে মেয়েটির সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিলেন না। চায়ের কাপটা তুলতে গিয়ে দেখল হাতটা থরথর করে কাঁপছে। চা-এর সময় এটা তার নয়। আরও কড়া কিছুর জন্য গলাটা তৃষিত হয়ে আছে। মনটা বিষিয়ে গেল। অনেক তো হল নীলাঞ্জন, বড় বড় চোখের কোমল চাউনিতে উতলা হবার শৌখিনতা কেন তোমার? বেশীক্ষণ আর আলোচনা চালাতে পারল না সে। আবার আসবে বলে আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল ভবতোষবাবুর বৈঠকখানা থেকে।

পরের দিন বেলা এগারোটার সময় একটা দোকান থেকে এক বোতল মদ কিনে বেরিয়ে আসছে এমন সময় সেই মেয়েটির সঙ্গে দেখা। হাতের বোতলটার জন্য নীলাঞ্জনের ভীষণ লজ্জা লজ্জা করতে লাগল। বহুদিন পর তার এই সংকোচ। কোনরকমে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। মেয়েটি সটান তার কাছে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। কড়া গলায় জিজ্ঞেস করল, "কদিন এসব চলছে?"

'অনেক বছর হল, এখন অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে।'

'আয়নায় একবার নিজের চেহারাটা দেখেছেন? নাকি সে সবও অভ্যেসটা হবার সঙ্গে সঙ্গে পাটে উঠেছে?'

'না, আয়নায় মুখটা অন্তত একবার দেখতে হয়। দাড়ি কামাবার সময়। তবে কিছু আর করার নেই, হাল ছেড়ে দিয়েছি।'

মেয়েটির মুখ পরিচিত সেই স্নিগ্ধ হাসিতে নরম হয়ে গেল। লাজুক লাজুক গলায় বলল, 'ছিঃ ছিঃ, আপনার সঙ্গে এরকম করে কথা বলার সাহস কেমন করে যে হলো! আপনি তো আমার নামটাও জানেন না। আমি শ্যামলী।'

নীলাঞ্জন কিছু বলার আগেই মেয়েটি বেণী দুলিয়ে বলল, 'আপনার নাম আমি জানি। নীলাঞ্জন গুপ্ত। কাল সারারাত ধরে বাবা আপনার সুখ্যাতি করছিলেন। বলছিলেন বহুদিন পর উনি একজন কথা বলার লোক খুঁজে পেয়েছেন।'

নীলাঞ্জন খুশী হল। হাসিমুখে বলল, 'আপনার বাবা মিথ্যে প্রশংসা করেছেন। ওঁর পাণ্ডিত্যের কাছে আমি দাঁড়াতেই পারি না।'

শ্যামলী বলল, 'বাবার মত লোক হয় না। কত বড় মন ওঁর লোকে বুঝল না। দিনরাত ওঁর বইপত্র নিয়ে আছেন। এর জন্য মা আর দিদির কাছে কত গঞ্জনা শুনতে হয়। উনি গায়েই মাখেন না।'

নীলাঞ্জন এবার একটু অস্বস্তি বোধ করতে শুরু করে। হাতে একটা বোতল নিয়ে কতক্ষণ আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গল্প করা যায়।

শ্যামলী কিন্তু স্রোতের মত কলকল করে চলে। কথায় কথায় হাসির ঝর্ণা বয়। বলে. 'আমি কিন্তু বাবাকে বলেছি ওঁর সমজদার বন্ধুটিকে দেখলে হাসি পায়। এমন ক্যাকলাশের মত চেহারা। একটা চায়ের কাপ তুলতে যাকে হিমসিম খেতে হয় সে আবার কেমনতর পুরুষ মানুষ!'

অপমানটা নীলাঞ্জনের গায়ে লাগল না। শ্যামলীর চোখের স্নিগ্ধতার ছোঁয়ায় মনের সব গ্লানি মুছে যায়। সে জিজ্ঞেস করে, 'আপনাদের দেশ কি এই

কুচবিহারেই না অন্য কোথাও।'

শ্যামলী বলে, 'আদত বাড়ী ছিল ময়মনসিং-এ। কিন্তু দুপুরুষ ধরে আমরা এই কুচবিহারেই আছি। আপনি আগে কোনোদিন এখানে এসেছেন?'

নীলাঞ্জন বলে, 'না, কিন্তু দু'দিনেই প্রেমে পড়ে গিয়েছি।'

কথাটা শুনে শ্যামলী এক মিনিট একটু ঘাবড়ে যায়। তারপর খিলখিল করে হেসে ওঠে। বলে, 'এখানে দেখার অনেক কিছু আছে। আপনি বোধহয় এ দুদিন শুধু ঘরে বসে বসে ঐ সব ছাইপাশ গিলেছেন।'

নীলাঞ্জন হঠাৎ সাহস করে বলে ফেলে, 'আপনি আমায় শহরটা একটু ঘুরে ফিরে দেখিয়ে দেবেন। আমার চেনাজানা এখানে আর কেউ নেই।'

শ্যামলী এক মুহূর্তের জন্যও ইতস্তত করে না। বলে, 'নিশ্চয়ই। আজ সন্ধ্যায় আপনি তো আসছেন আমাদের বাড়ী। বাবার কাছে আমি অনুমতি নিয়ে নেব। কোন অসুবিধে হবে না।'

তারপর নিজের মনে হাসতে হাসতে চলে গেল শ্যামলী। নীলাঞ্জন নিজের ওপর বিরক্ত হয়। এ আবার কি খেলায় পেয়ে বসল তাকে। একটা কিশোরী মেয়েকে তার সঙ্গীদের থেকে সরিয়ে এনে নিজের রিক্ততা দূর করার এই ব্যর্থ চেষ্টা সে না করলেই ভাল করত।

সারাটা দুপুর কেমন নেশায় পেয়ে বসল নীলাঞ্জনকে। সন্ধ্যা লাগতে না লাগতেই ভবতোষবাবুর বৈঠকখানায় গিয়ে হাজির হল। আজ আর পুরোনো পুঁথির আলোচনায় কেন যেন মন বসতে চাইল না। এক লহমা শ্যামলীর দিদি আর মার দেখা মিলল। ওর ভাগ্নেটাও একবার মুখ ভেঙচে চলে গেল। কিন্তু শ্যামলী বাড়ী নেই না কি?

হঠাৎ ঘোর ভেঙে গেল তার। শ্যামলী এসে গেছে। চান করেছে। সামান্য একটু প্রসাধনও করেছে। সুন্দর একটা গন্ধ নাকে এল। দেখল ওর খোঁপায় কয়েকটা সাদা ফুল গোঁজা। শ্যামলী তার বাবাকে বলল, 'বাবা, এখন তোমার গল্প বন্ধ কর। আমি নীলাঞ্জনবাবুকে রাজবাড়ী দেখিয়ে নিয়ে আসি।'

ভবতোষবাবু বললেন, 'কাল সকালে দেখালে ভাল হত না মা।'

শ্যামলী বলল, 'মোটেই না। আজ পূর্ণিমা। চাঁদের আলোয় খুব ভাল লাগবে। নীলাঞ্জনবাবু ঐতিহাসিক মানুষ তো।'

নীলাঞ্জন একটু অবাক হয়। শ্যামলী খুব ছেলেমানুষ। কলকাতার উচ্চবিত্ত সমাজের ফরোয়ার্ড মেয়েদের সঙ্গে ওর একটুও মিল নেই। কিন্তু ওর ব্যবহারে কোন আড়ষ্টতা নেই। সীতার সঙ্গে তার আলাপের গোড়ার কথা মনে পড়ে। সীতা খুব শান্ত, লাজুক ধরনের মেয়ে ছিল। অল্প আলাপেই এতটা সহজ সে হতে পারত না। নীলাঞ্জনের মন হঠাৎ বিগড়ে যায়। আচ্ছা, সীতার কথা সে ভাবতে বসল কেন। সে তো আর শ্যামলীর সঙ্গে প্রেম করতে যাচ্ছে না। আর একটা জিনিসও তাকে চঞ্চল করে তুলল। সীতার কথা মনে করতে আজকাল আর তার তেমন ভয় হয় না। সীতার মুখটা মনে পড়লে সে আগের মত ছটফট করে না আর। কালের গতি বোধহয়। সুমিত্রার কথা মনে এল। পুরোনো স্মৃতি আঁকড়ে থেকে মানুষ বেশীদিন বেঁচে থাকতে পারে না।

একটা রিক্শয় করে শ্যামলী নীলাঞ্জনকে নিয়ে চলল রাজবাড়ীর ফটকের

দিকে। শহরের অনেককেই সে চেনে। দেখা হলে রিক্‌শ থামিয়ে হাসি মুখে কথা বলে। সঙ্গে একটি অপরিচিত পুরুষ থাকায় সে একটুও ঘাবড়ায় না। বরং নীলাঞ্জনই কেমন অপ্রতিভ হয়ে যায়। একটা মস্ত বড় ঝিলের পাশ দিয়ে রিক্‌শ এগিয়ে চলে। শ্যামলী বলে, 'ওদিকটায় ঠাকুরবাড়ী। ওখানে সোনার দেবী প্রতিমা দেখাতে নিয়ে যাব আপনাকে কাল সন্ধ্যাবেলায়।'

কেমন সহজে শ্যামলী কাল সন্ধ্যার জন্য একটা ডেট্ করে নিল। একবার একটু সন্দেহের চোখে তাকাল ওর দিকে নীলাঞ্জন। না, ওর মধ্যে কোকেট্রির চিহ্নমাত্র নেই। মাঝে মাঝে শুধু দুষ্টু হাসিতে চোখ দুটোতে বিদ্যুৎ খেলে যায়। আশ্চর্য, সন্ধ্যা হয়েছে অনেকক্ষণ, কিন্তু বোতল গেলাস নিয়ে বসার তেমন তাগিদ তো বোধ করছে না সে।

সন্ধ্যারাগে রাজপ্রাসাদের ছায়াঘেরা সৌন্দর্য চোখে পড়ামাত্র নীলাঞ্জন কিছুক্ষণ স্থান কাল পাত্র সব ভুলে গেল। পূর্ণিমার চাঁদের পান্ডুর আভায় লাল রং-এর ঐ প্রকান্ড ইমারত বড় স্নিগ্ধ দেখায়। হৃতগৌরব মহারাজের দম্ভ আর প্রতাপ আজ স্মৃতির গভীরে ডুবে গেছে। আজ ঐ নিঃশব্দ পুরীতে অনেক ঐশ্বর্য আছে, কিন্তু রোশনাই নেই। শ্যামলী বলে চলল রাজা রাজড়াদের পুরোনো কাহিনী। একদিন কত কি ছিল, কত গান, কত নৃত্যপরা রমণীর নূপুরনিক্কণ, কত প্রেম, কত ব্যভিচার, সব উপন্যাসের মত শোনায়। মোহাবিষ্ট নীলাঞ্জন সব কথা শোনে না। এক সময় ঘোর ভাঙে। বলে, 'চলুন অনেক রাত হল, আপনাকে বাড়ী পেঁাছে দিয়ে আমি হোটেলে ফিরে যাব।'

শ্যামলী আর নীলাঞ্জন বড় রাস্তার দিকে এগিয়ে যায় রিক্‌শর খোঁজে। শ্যামলী জিজ্ঞেস করে, 'কেমন লাগল?' নীলাঞ্জন বলে, 'চমৎকার। শ্যামলী হঠাৎ হেসে ওঠে। বলে, 'আমি এ শহরের রাস্তাঘাট ছেলেবয়স থেকে চিনি। আপনাকে আর আমায় বাড়ী পেঁাছে দিতে হবে না। কেন শুধু শুধু সময় নষ্ট করবেন। আপনার তো এখন আবার ওসব খাবার সময় হল।'

নীলাঞ্জন বলে, 'একটু দেরী হলে কিছু যায় আসে না। ওকে বাড়ীর দরজায় নামিয়ে দেবার সময় জিজ্ঞেস করে, "কাল সন্ধ্যায় আমাকে নিয়ে মন্দিরে যাবেন তো।" শ্যামলী ঘাড় দুলিয়ে বলে, 'হ্যাঁ।'

পরদিন সময় যেন আর কাটতে চায় না। সারাক্ষণ অস্থির হয়ে নীলাঞ্জন তার নিজের ঘরে ঘুরে বেড়ায়। মদের বোতলটা খুলিখুলি করেও সরিয়ে রাখে। সন্ধ্যা হতে না হতেই চলে যায় ভবতোষবাবুর বাড়ী। দেখে শ্যামলীও তৈরী হয়ে আছে। আজকে ওকে নতুন চোখে দেখতে পায় সে। একটা গরদের শাড়ি পরেছে। খোলা চুল পিঠ ছাপিয়ে নীচে নেমে গেছে। কপালে একটা বড় টিপ। হাতে ডালিতে করে অনেক ফুল। সে যাওয়া মাত্র শ্যামলী বলে, 'চলুন। তাড়াতাড়ি না গেলে আরতি শেষ হয়ে যাবে।'

রাজাদের রাজত্ব গেছে, ধনদৌলতও অনেক গেছে। মন্দিরেও তাই আর হয়তো আগের মত তেমন জলুস নেই। তবুও ভক্তি চিরন্তন। এখনও অসংখ্য নরনারী সন্ধ্যাবেলা মন্দিরে আসে। ঘণ্টা বাজায়। প্রণাম করে। প্রার্থনা করে, যেন তাদের মনস্কামনা পূর্ণ হয়।

মন্দিরে এসে শ্যামলী নীলাঞ্জনের কথা ভুলেই যায় যেন। এখানে সে

আত্মস্থ। আভূমিপ্রণতা যে সেও তার ইস্টদেবতাকে শরণ করে। এক মুহূর্তের জন্য নীলাঞ্জনের চোখ দুটো শ্যামলীর আন্দোলিত দেহসৌষ্ঠবের আকর্ষণে ঝক ঝক করে ওঠে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সংযত করে সে এগিয়ে গিয়ে করজোড়ে নমস্কার জানায় ধূপের ধোঁয়ার প্রতি। মন জানতে চায়, তার ভগবান কি এখানে আছেন?

আরতি শেষ হল। শ্যামলী হাসি মুখে বেরিয়ে এল মন্দির থেকে। সৌম্য দীপ্তিতে ঝলমল করছে ওর মুখ। হাসিতে কি স্বচ্ছ সরলতা। বলল, 'ঠাকুর দেবতায় নিশ্চয়ই আপনার বিশ্বাস নেই।'

নীলাঞ্জন মজা পায়। বলে, "ও কথা কেন বলছেন, আমি মদ খাই বলে?"

শ্যামলী বলে, "আচ্ছা, এই তো বেশ এখানে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যা ৮টার সময় আমার সঙ্গে গল্প করছেন। মদ না খেয়েও তো দিব্যি আছেন। তবে সব সময় মদ মদ করেন কেন বলুন তো?"

নীলাঞ্জন অল্প একটু সময় বিরক্ত হয়। তারপর বলে, "সেসব কথা বলতে শুরু করলে একটা মহাভারত দাঁড়িয়ে যাবে।"

শ্যামলী বলে, "আজ তা হলে থাক। কিন্তু একদিন আমি শুনবোই শুনবো।"

নীলাঞ্জন বলে, "কিন্তু আমি আর এখানে কতদিন। তারপরে আপনার সঙ্গে আর আমার দেখা হবে কি?"

অন্ধকারে কেন যেন নীলাঞ্জনের মনে হয় শ্যামলীর চোখ দুটো ছলছল করে ওঠে। নিশ্চয়ই চোখের ভুল।

ওরা পথ চলতে থাকে। চুপচাপ।

হঠাৎ শ্যামলী বলে ওঠে, "আপনার সঙ্গে এই ক'দিন ঘুরে বেড়াচ্ছি। প্রতিদিন আপনি বাবার কাছে যাচ্ছেন। অথচ আমরা পরস্পরের কতটুকুই বা জানি। আমার জানতে ইচ্ছে করে, আপনার করে কি না জানি না। আবার মাঝে মাঝে কি মনে হয় জানেন? জেনেই বা কি হবে? একজন মানুষ আর একজন মানুষকে কতটুকুই বা জানতে পারে। আর দু' জনের কাছে দুজন একেবারে চেনা মানুষ হয়ে গেলে সেটাই বা কি খুব ভাল কথা? রহস্যের একটা আলাদা আকর্ষণ আছে, তাই না।"

নীলাঞ্জন কথার জবাব দেয় না। শীতটা বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। গায়ের টুইড কোটের কলারটা উঁচু করে গলা ঢাকে। আজ সন্ধ্যায় আর মুখ খুলবে না সে। খুব সাবধান হবার সময় এসেছে। শ্যামলী কিছু একটা বলতে চাইছে সে বুঝতে পারে। কিন্তু সে যা ভাবছে তা কি সত্যি? কি করে এমন হল? মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে। নীলাঞ্জন অস্বীকার করতে পারে না একটা মিষ্টি গন্ধ বাতাসে ভেসে আসছে, একটা মিষ্টি ভাবনার গন্ধ।

শ্যামলী হঠাৎ লঘু হয়ে যায়। হাসতে হাসতে বলে, 'মোটা কোটটা গায়ে দিলে আপনাকে আর তেমন রোগা দেখায় না। গলায় একটা টাই বাঁধেন না কেন? আপনি তো সাহেব মানুষ, আপনাকে বেশ মানাবে।'

নীলাঞ্জন শুধু বলে, 'টাইফাই আমার সব ছিঁড়ে গেছে। কাছে একটাও নেই।'

শহরের সব কিছুই প্রায় দেখা হয়ে গেছে। কলকাতায় ফিরে যাবার দিনও

এগিয়ে আসছে। হঠাৎ নীলাঞ্জনের মাথায় একটা দুঃসাহসী পরিকল্পনা এল। কিছু টাকা খরচ করতে হবে। কিন্তু হিসেব করে দেখল শ্যামলীর সাহচর্যের ফলে একটা সুবিধে হয়েছে, এ কদিনে তার মদের খরচটা অনেক কম হয়েছে। বাস স্টেশনে খোঁজ নিয়ে সে জানতে পারল একটা গাড়ী ভাড়া করে শহর থেকে তিস্তা নদী পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে আসা যায়। খুব সুন্দর রাস্তা। কোন বিপদের ভয় নেই। শ্যামলীকে জিজ্ঞেস করল, 'একদিন এক সঙ্গে ঘুরে এলে কেমন হয়?' শ্যামলী তো খুশীতে ডগমগ হয়ে উঠল। গাড়ীতে বেড়াতে তার খুব ভাল লাগে। তারপর কি ভেবে একটু ম্লান হয়ে যায়। সামান্যই ব্যাপার। বাবার কাছে অনুমতি পাওয়া শক্ত হবে না। কিন্তু মা বাগড়া দেবার চেষ্টা করবে। তারপর ফিক করে হেসে বলল, কুছ পরোয়া নেই, আমি কিছু একটা বলে ম্যানেজ করে নেব।

পরেরদিন সকাল সকাল দুজনে বেরিয়ে পড়ল গাড়ীতে। ড্রাইভার পেট্রল ভরে নিয়ে চালিয়ে দিল পঙ্খীরাজ, হাওয়ার বেগে। শহর থেকে খানিকটা এগিয়ে গিয়েছে। শ্যামলী ড্রাইভারকে একটু থামতে বলল। লাজুক লাজুক মুখ করে ব্যাগ থেকে একটা ঝকঝকে নতুন টাই বের করে নীচু গলায় বলে ফেলে "নিন, পরে দেখুন তো কেমন লাগে।"

নীলাঞ্জন মনে মনে হাসে। ও রকম রঙচঙে টাই পরা সাধারণত ওর রুচিতে বাধে। তবু বড্ড ভাল লাগল। বলল, "তুমিই পরিয়ে দাও না।"

শ্যামলী কাঁপা কাঁপা হাতে ওকে টাইটা পরিয়ে দিল। নীলাঞ্জন বলল, "তুমি আমার থেকে বয়সে অনেক ছোট। তাই তুমি বললাম, কিছু মনে কোর না।"

শ্যামলী বলে, "তাতে কি।"

নীলাঞ্জনঃ তুমিও আমাকে ইচ্ছে করলে তুমি বলে ডাকতে পার।

শ্যামলীঃ পাগোল! আমি মরে গেলেও তা পারব না।

নীলাঞ্জন কিছু বলে না। গাড়ী আবার গতিবেগ বাড়িয়েছে। গ্রামগুলোর মধ্যে অনেক অনেক মাইলের ব্যবধান। চারদিকে খোলা মাঠ। ও জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকে। মাঝে মাঝে শ্যামলীর দিকে চোখ ফেরায়। দেখে ওর চুল উড়ছে, হাওয়ায় আঁচল খসে গিয়ে উদ্ধত বুক দেখা যাচ্ছে। কিন্তু ওর খেয়াল নেই। গোগ্রাসে চারদিকের দৃশ্য গিলছে।

তিস্তার কাছাকাছি এলে পৃথিবীর চেহারাটা কেমন অদ্ভুত মনে হয়। চারদিকে জমাট কাদার বিস্তৃতি। দূরে সাদা ফিতের মত নদী। ব্রিজটা খেলনাব মত দেখায়। কোথাও জনবসতির চিহ্ন নেই। নীলাঞ্জনের হিচককের একটা ছবির দৃশ্য মনে পড়ে। জনহীন প্রান্তরে একজন মানুষকে একটা হেলিকপ্টারে করে কারা তাড়া করেছে ; সে লুকোবার জায়গা পাচ্ছে না। এ জায়গাটাও যেন তেমনি। শুধু সে আর শ্যামলী আর ঐ ড্রাইভার যার নামটাও সে জানে না। অনেকক্ষণ পর ব্রিজের কাছাকাছি পেঁছোলে একজন চাষীর দেখা পাওয়া গেল। হাতে দুটো বেলে হাঁস। শ্যামলী যেন অনেক দূর থেকে বাস্তবে ফিরে এল। বলল, "আপনি হাঁসের মাংস খান?"

"খাই। কিন্তু এখানে কে রেঁধে দেবে?"

শ্যামলী উত্তর দিল না। নীলাঞ্জন বুঝল এ ব্যাপারে ওর বিশেষ পারদর্শিতা

নেই। টিফিন ক্যারিয়ারে করে ওরা কিছু খাবার এনেছিল। দুজনে মিলে খুব মজা করে খেল। গলা ভেজানর জন্য কড়া কিছুর প্রয়োজন একেবারেই অনুভব করে না নীলাঞ্জন।

শ্যামলীই বলে, 'এক বোতল ঠাণ্ডা বীয়ার হলে আপনার বেশ জমত, না? আচ্ছাঃ শীতে কি বীয়ার খায়?'

নীলাঞ্জন বলে, 'খাবে না কেন? বিলেতে তো সব সময়ই ঠাণ্ডা, সবাই তো বীয়ারই খায়। কিন্তু আজ ঠিক এই সময় ওসবের কোন দরকার আছে বলে মনে হচ্ছে না।'

শ্যামলী ওর দিকে তাকিয়ে হাসল। বিজয়িনীর হাসি। ভুবনমোহিনী হাসি।

ফেরার পথে ওরা আর দৃশ্য দেখল না। কথা বলল। অনর্গল কথা। শ্যামলী বলল নিজের কথা। কোন রকমে কলেজের শেষ ধাপে পেঁছেছে। মা বিয়ের জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। সবারই ডিমানড বড্ড বেশী। ওর বাবার সামর্থ্যে কুলোয় না। দিদির বিয়েতে অনেক পয়সা খরচ করতে হয়েছে।

নীলাঞ্জন বলে ফেলে, 'তোমার ভাগ্নেটা একেবারে বিচ্ছু।'

শ্যামলী রেগে যায়। ভাগ্নের গুণপনার বিশদ বিবরণ দিতে বসে। বাধ্য হয়ে নীলাঞ্জনকে শুনতে হয়।

নীলাঞ্জনও বলে অনেক কথা। তার জীবনের আশা, আকাঙ্ক্ষা, ব্যর্থতা আর শোচনীয় পরাজয়ের কথা। তার পানাসক্তির কথা। ভগ্ন স্বাস্থ্যের কথা। সব কিছু বলা যায় না। বলেও না। শুধু ভাবে এত কথাই বা বলছে কেন সে।

শ্যামলী চুপ করে চেয়ে থাকে ওর দিকে। দুঃখ প্রকাশ করে না। ভর্ৎসনা করে না। সহানুভূতিও দেখায় না। নীরবে বোঝার চেষ্টা করে।

তারপর যাত্রার শেষ। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে অনেক কিছু ঘটে গেল। সাক্ষী রইল শুধু তাদের সারথি। নামটি যার জানা হলো না।

পরদিন কাউকে কিছু না জানিয়ে নীলাঞ্জন সোজা কলকাতায় ফিরে এল। প্রথমদিন প্রাণ ভরে মদ খেল। তারপর দুদিন এক মনে ওর লেখার কাজটা চুকিয়ে ফেলল। কিন্তু ও জানে শীঘ্রিরই নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করার সময় আসবে। আরও দু-চারদিন দারুণ অস্থিরতার মধ্যে কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত একটা চিঠি লিখল শ্যামলীকে।

"শ্যামলী,

সেদিন কিছু না বলে চলে এলাম। কারণ, ভেবেছিলাম পালানো ছাড়া আমার আর কোন রাস্তা নেই। কিন্তু পালাতে আর পারলাম কই? আমি রিক্ত। আমি ক্লান্ত। তুমি আমাকে অনেক কিছু দিতে পার। তুমি আসবে?

—নীলাঞ্জন।"

শ্যামলীর উত্তর এল কদিন পর। নীল খামে নীল কাগজ। দুটি মোটে লাইন। কিন্তু সে কটি কথার কত দাম।

"নীলাঞ্জন,

আমার যা বলার তা কি আমি আগেই বোঝাতে পারিনি? কবে তুমি আমায় নেবে?

—শ্যামলী।"

মধু গন্ধে-ভরা মৃদুস্নিগ্ধছায়া। সারাদিন নীলাঞ্জন বিছানায় শুয়ে থাকে। কি অনাবিল শান্তি। সেদিন সীতার কথা মনে এল না একটিবারও।

(বর্তমান : পান্থশালা কাহিনী)

পান্থশালার নীচের তলায় একরাশ বিদেশী আর বিদেশিনীর আড্ডা। তারা এসেছে বিভিন্ন দেশ থেকে, বিভিন্ন মহাদেশ থেকে। তাদের ভাষাও প্রায়ই আলাদা। মিল শুধু একটি জিনিষেই। তাদের চামড়ার রং। বৈজ্ঞানিক মতে পিংকো-গ্রে। আমরা বলি সাদা। ওদের নীতিধর্ম একান্তই নিজস্ব। এক ধরনের পথচলার উদারতা। পান্থশালার কর্তৃপক্ষ ওদের ব্যাপারে বিশেষ হস্তক্ষেপ করে না। কে কার ঘরে রাতে গিয়ে শুচ্ছে, কে প্রকাশ্য জায়গায় কার গোপন জায়গা স্পর্শ করছে এসব দেখে দেখে সবার গা-সওয়া হয়ে গেছে। স্থানীয় লোকেরা বেয়ারা বাবুর্চি'রা ওদের চালচলন দেখে খুব হাসাহাসি করে। ওদের মধ্যে যাদের সাহস একটু বেশী তারা কারও কারও গায়ে হাত বোলাতেও কসুর করে না।

এদের মধ্যে আবার দুটো মেয়ে এরই মধ্যে বেহায়াপনার জন্য নাম করে ফেলেছে। নীলাঞ্জন খবর পায় পাশের ঘরের দুই মারোয়াড়ী যুবকের কাছে। এ দুটি ছেলে প্রথম দিন শুধু পেট পুজো করতেই ব্যস্ত ছিল। গণ্ডায় গণ্ডায় মাছ, ডিম আর পর্বতপ্রমাণ ছ্যানা গেলায় তাদের কি উৎসাহ। পরদিন সকালেই কিন্তু তারা আরও মুখরোচক জিনিষের সন্ধান পেয়ে গেল। বিকেলের দিকে দুজনকে খুব হাসতে হাসতে সমুদ্রতীর থেকে ফিরে আসতে দেখে নীলাঞ্জনের হঠাৎ কৌতূহল হল। জিজ্ঞেস করল, "কি ব্যাপার শেঠজি। এত হাসির কি খুঁজে পেলে সমুদ্রতীরে?"

ছেলে দুটোর হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যায় যেন। ওদের মধ্যে যেটি একটু বেশী সবাক সে বলে, "কি বলব দাদা। ছুঁড়িটা বলে কি না আই অ্যাম টোয়েণ্টিফাইভ। তিরিশ আর এ জন্মে দেখতে হবে না ওকে। আর সঙ্গে যে আর একটা ছুঁড়ি আমার মায়ের বয়সী হবে, বলে আই অ্যাম টোয়েণ্টি টু।"

নীলাঞ্জন বুঝতে না পেরে আরও বিস্তারিত রিপোর্ট চায়।

"আরে দাদা, আপনি শুধু ঘরে বসে বসে সরাব খাবেন আর ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকবেন তো মজা দেখবেন কি করে? যান দেখে আসুন লেড়কী দুটোকে। বীচে বসে নিপ্‌ বটলে রাম খাচ্ছে আর উদম হয়ে সানবাথ করছে। বেশরমি।"

নীলাঞ্জন বুঝতে পারল কাদের কথা হচ্ছে। সেই দুটি মেয়ে যাদের সঙ্গে সিংজীর ঘরে আলাপ হয়েছিল। সামান্য ক মিনিটেই ওদের খারাপ লেগেছিল। জেনি আর ক্যাথারিন। অস্ট্রেলিয়ান মেয়ে। একজনের বাবা ট্রাক ড্রাইভার আর একজনের বাবাও ওরকমই কি যেন করে। এদেশে অবশ্য দুজনেই মেমসাহেব।

নীলাঞ্জনের সাদা চামড়ার সম্বন্ধে কোন বিদ্বেষ নেই। সাধারণত সাদা চামড়ার ছেলে-মেয়েগুলো এদেশে এসে ওদের বেলেল্লাপনা নিজেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে। ওদের দেখতে নীলাঞ্জনের মজাই লাগে। যেমন মজা লাগে তার সোনাগাছিতে, আনন্দলোভী পুরুষদের দেখে। একবার সারারাত সোনাগাছির ঠিক মধ্যিখানে পরিচিত এক ভদ্রলোকের একটা গুদোমে বসে সে ঐ মানুষ-গুলোর মুখ দেখেছিল! অবশ্য সাদা চামড়ার ছেলেমেয়েগুলোর সঙ্গে একদিকে তুলনা হয় বরং দেহব্যবসায়িনীদের সঙ্গে। ওদের কাছে দেহসম্ভোগের সামান্য-তম রহস্যটুকুও একটা বয়সের পর অবশিষ্ট থাকে না, তাই যৌনলীলায়ও ওদের বড় নিরানন্দ মনে হয়। বিশেষ করে যদি তার সঙ্গে থাকে গাঁজার ধোঁয়া।

সোনাগাছির বেশ্যাদের সম্বন্ধে নীলাঞ্জনের কিন্তু গভীর শ্রদ্ধা। ওরা চিরকালই অন্ধকারের শিকার। আলোতে আসতে ওদের বেজায় ভয়। নীলাঞ্জনের এক বন্ধু একটি বেশ্যাকে বিয়ে করার জন্য পাগল হয়েছিল। এমন কি বাড়ীর সবাইকেও রাজী করিয়েছিল শেষ পর্যন্ত। কিন্তু মেয়েটিই বেঁকে বসল। ওদের কাছে সাধারণত মানুষের ধরি মাছ না ছুঁই পানি মনোভাবটাই বেশী সহজ-বোধ্য মনে হয়। একটা বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী আছে ওদের জীবনে। ছলাকলা নেই। কাজ এবং কাজের জন্য ন্যায্য পাওনা। উচিত কথা বলতেও ওরা পারে নির্মমভাবে।

একবার ওপাড়ার একটি মেয়েকে নীলাঞ্জন দেবদাস দেবদাস মুখ করে বলেছিল, "জান, আমাকে কেউ ভালবাসে না।" মেয়েটি বোকাবোকা মুখ করে উত্তর দিয়েছিল, "কেন গো, তোমার মা বাপ কোথায় গেল?" বুদ্ধিমতী মেয়ে। একটি কথার ধাক্কায় নীলাঞ্জনের উদাস উদাস ভাব উবে গেছল।

জেনি আর ক্যাথারিন সম্বন্ধে মাঝে মাঝে স্থানীয় লোকেরা যখন বলে "বেবুশ্যে মেয়ে" নীলাঞ্জনের কেমন রাগ হয়। সোনাগাছিতে অল্প যে কটি মেয়ে দেখেছে তাদের সঙ্গে এই অস্ট্রেলিয়ান মেয়ে দুটোর তুলনাই হয় না। বেহায়া মেয়ে দুটো ভেবেছে যেন একটা চিড়িয়াখানায় ওরাই শুধু মানুষ। হা হা করে হাসছে। ভারী ভারী পাছা দোলাচ্ছে। জেনি তো একদিন মদ টেনে প্রায় উলঙ্গ হয়ে খাবার ঘরে চলে এল। কেমন ঝোলা ঝোলা সব। গুরুগম্ভীর মেজাজের কয়েকটি সাহেব-মেম টুং টাং শব্দ করে খাচ্ছিল। ওদের বিব্রত মুখ দেখে নীলাঞ্জন খুব মজা পেয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত জেনি আর ক্যাথারিনের খপ্পরে পড়ল জেলেদের ছেলে গোপাল। উদাসপ্রেমিকের মত সে লছমির খোঁজে সমুদ্রতীরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। দেখে ঐ সাদা মেয়ে দুটো—পরনে দু ফালি কাপড় ছাড়া আর কিছু নেই—হাত তুলে তাকে ডাকছে। গোপাল এগিয়ে গেল, ওরা ইশারায় গল্প জমিয়ে নিল। গোপাল বলল, চল সাঁতার কাটি। বহু সমুদ্র পার হয়ে এলেও মেয়ে দুটোর সমুদ্র সম্বন্ধে খুব ভয়। ওদের লীলাখেলা বেলাভূমিতেই শেষ। বলল, ওরা যাবে না। তখন গোপাল নিজেই সমুদ্রে নেমে ওদের বাহবা কুড়োতে লাগল। সমুদ্রের সাদা ঢেউ-এর সঙ্গে দাপাদাপি করতে লাগল ওর সুঠাম কালো শরীর।

এই শুরু। তারপর প্রায়ই গোপালকে ওরা ডেকে নিয়ে যায়। জেনি ক্যাথা-রিনের চেয়ে বয়সে বড়, অনেক বেশী বেহায়া। গোপালকে নিয়ে খেলা করতে

ভালবাসে। ওকে বলে তার বুকের খাঁজে বালি ছড়িয়ে দিতে। কখনও আঙুল দিয়ে ওর মুখে সুড়সুড়ি দেয়। আবার কখনও আদরের কথা বলতে বলতে গোপালের গায়ে ওর মেছেতাপড়া কোঁচকানো চামড়া ঘষে। কটা চোখে বিদ্যুৎ খেলানোর ব্যর্থ চেষ্টা করে। গোপাল হয়তো খানিকক্ষণ মোহাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আবার সে স্বাভাবিক হয়ে লছমিকে দু চোখ দিয়ে খুঁজে বেড়ায়। লছমি কিন্তু দেখেও দেখে না।

তারপর একদিন মরিয়া হয়ে গোপাল জেনির ঘরে এল। দিশী মদ খেয়েছে খানিকটা। চোখে কাজল মেখেছে। আজ সে প্রমাণ করবেই সে জোয়ান মরদ। ভিন দেশী বিলিতি মেমও তাকে দেখে দুর্বল হয়। গিয়ে দেখে ঘরে তালা ঝুলছে। বেয়ারারা ওকে চিনতো। বলতো ঢল্যানি মেমের ছোকরাবাবু। আজ তাকে ঐ অবস্থায় দেখে মুচকি হাসে। বলে, চলে গেছে। ফ্রেন্ড চলে গেছে। গোপালপুর। গোপাল ফিরে যায় চুপসে যাওয়া বেলুনের মত। ঝাউবনের ধারে হঠাৎ শোনে খিলখিল হাসি। অমাবস্যার রাত। তবুও দেখতে পায় লছমি হাসছে। বহুদিন পর হাসছে। হাসি আর থামে না। গোপালের দিকে আঙুল দেখায় আর হাসে। "জব্দ। কেমন জব্দ। এত সাজ করে ধোঁকা খেলি।" গোপালও হাসে। দুজনে প্রাণ খুলে হাসে।

১০

সিংজী আর মদের বোতলের সঙ্গ একটু একঘেয়ে লাগছে। নীলাঞ্জন ঠিক করল একটা দিন কাটিয়ে দেবে পুরোনো ইতিহাসের সাহচর্যে। শ্যামলীর তেমন গরজ নেই। শরীরটাও ওর খুব ভাল নেই। বলল, তুমি একাই ঘুরে এস। আমি একটু রেস্ট নেই। নীলাঞ্জন বলল, 'তথাস্তু।'

লাকসারির বাস অজন্তা। ঐতিহাসিক নাম। অজন্তাই আজ উৎকলের কিংবদন্তী আর স্থাপত্যের মিলিত অতীতের সেতু। এই যাত্রায় নীলাঞ্জনের সঙ্গে আছে শুধু পান্থশালার কয়েকজন আবাসিকই নয়, আছে একজন অভিজ্ঞ গাইড। বাঙালী ভদ্রলোক। নাম প্রিয়ব্রত চ্যাটার্জী। সাহেবিয়ানা দেখানোর চেষ্টা করেন নিজেকে শ্যাটার্জী বলে। ভদ্রলোকের পঞ্চাশের ওপর বয়স। রোগা, দড়ির মত পাকানো শরীর। জিজ্ঞেস করলে বলেন বছরখানেক এ অঞ্চলে এসেছেন ইতিহাসের গবেষণার কাজে। পরে অবশ্য কথাবার্তা চালচলনে বোঝা যায় এই কাহিনীতেও কিংবদন্তীর বড় একটা অংশ আছে। আসলে তিনি গাইডের কাজ করছেন বহু বছর। নিজের বিষয়ে এতদিনে কিছু দখলও হয়েছে। এটাও অবশ্য এক ধরনের গবেষণা।

দিনের পর দিন স্বল্প পরিসর একটা বাসে মাইক্রোফোনে একই বুকনি বলে যাওয়ার যে দুঃসহ পৌনঃপৌনিকতা তা থেকে রেহাই পাবার জন্য কিছু গাল গল্পের মধ্যে যদি কেউ একটু বৈচিত্র্য খোঁজে দোষ দেওয়া যায় না। সারাটা পথ মিঃ চ্যাটার্জির চ্যাঁচানিতেও যখন তার কান ঝালাপালা হয়ে যাচ্ছে এই ভেবে নীলাঞ্জন নিজের মনে ঐ অত্যাচারীর প্রতি সহানুভূতি আনার চেষ্টা করে। তবুও মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়। কেন যে মানুষ নিজের অসার জ্ঞান জাহির করার জন্য এত ব্যস্ত। বাসসুদ্ধ লোক তো মিঃ চ্যাটার্জিকে আর তার বক্তৃতা কিছুদিনের মধ্যেই বেমালুম ভুলে যাবে। নীলাঞ্জনও ভুলে যেত যদি সে এত বিরক্ত না হত। প্রিয়ব্রতবাবুর উদ্ধৃতিগুলো কার কি কাজে লাগবে? অধিকাংশ লোক তো শুনছেনই না কিছু। কোথায় যে একটা লাইন টানতে হয় অনেক লোকের তা মাথায় আসে না। যেমন প্রিয়ব্রতবাবু শোনালেন অনেক অপরিচিত বই-এর ভল্যুম নম্বর, চ্যাপ্টার নম্বর, প্যারাগ্রাফ (উনি ভুল করে বলেন স্ট্যানজা) নম্বর। উনি কি সত্যি সত্যি মনে করেন শ্রোতারা বিশ্বাস করে উনি ওসব বই পড়েছেন? একবার উনি বললেন, আবুল ফজল-এর উদু (উর্দু?) থেকে উনি অনুবাদ করছেন। চিন্তার অতীত। শুধু কি তাই। জ্ঞান ছড়ানোর মাঝে মাঝে উনি নানান টিপ্পনী ছাড়তেও ভোলেন না। ওড়িশার বুকে বসে বাঙালী পরি-

চালিত একটা বাসের কাঁচের পাঁচিলের আড়ালে তিনি এক মালী নিয়ে উৎকট রসিকতা করলেন। ঐ প্রসঙ্গে মিছিমিছি রবীন্দ্রনাথকে টেনে আনলেন। প্রিয়ব্রত-বাবু আরও জানালেন, "প্রসিদ্ধ এক ডাক্তারের অখ্যাতনামা লেখকপুত্র আমি বহুদেশ ঘুরে এসেছি। দেখেছি আলেকজান্দ্রিয়া আর ড্যামাস্কাসে আমাদের কাল চামড়া সম্বন্ধে কি ঘৃণা।" ও প্রিয়ব্রতবাবু! ভারতীয় লাঞ্ছনার এত নিদর্শন থাকতে ও দুটো জায়গার কথা কেন?—ওখানে কারুর রং তো সাদা নয়।

অত্যাচারী অবশ্য শুধু প্রিয়ব্রতবাবুই নন। ভারতবর্ষের যে কোন তীর্থ-স্থানেই যাও বা পর্যটক অধ্যুষিত জায়গায়, শান্তি পাবে না। কাউকেই নির্ঝঞ্ঝাটে ঘুরে বেড়ানোর স্বাধীনতা দেওয়া হয় না। পাণ্ডাদের অত্যাচার ভয়াবহ। তারপর আছে ফেরিওয়ালাদের নির্যাতন। ইতিহাস তাদের ঘ্যানঘ্যানানিতে পালিয়ে বাঁচে।

কোনার্কে এসে তবে একটু শান্তি। অন্তত দু ঘণ্টার জন্য মুক্তি। গাইড আর পাণ্ডাদের এখানে তবুও খানিকটা এড়ান যায়। কথা বলা যায় দূর অতীতের সঙ্গে।

বাসে গাইড শুনিয়েছিল কোনার্কের অবিস্মরণীয় সূর্যমন্দিরের নির্মাণ-কাহিনী। কিছুটা পুরাণ, কিছুটা ইতিহাস। সবটাই কুয়াশায় ঘেরা। শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব নিজ রূপযৌবনে দর্পিত। নারীসঙ্গমে পটু। নারদ তাকে জব্দ করতে চাইলেন। তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গেলেন এক জায়গায় যেখানে কৃষ্ণের ষোড়শসহস্র গোপিনী স্নানরতা। নারদ বললেন, শাম্ব, এই সুন্দরীরা তোমার দিকে ফিরেও তাকাবে না।' শাম্ব বলে, 'দেখা যাবে।' হাত বাড়াল সুন্দরীশ্রেষ্ঠা এক কৃষ্ণ-সহচরীর দিকে। শুরু হল বিশ্রম্ভালাপ। নারদ ইতিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে এসেছেন অকুস্থলে। পুত্রের ঔদ্ধত্যে পিতা রেগে আগুন। শাপ দিলেন শাম্বকে। সে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত হবে। তারপর অনুতপ্ত পুত্র যখন সমুদয় ঘটনা খুলে বলল, তখন তিনি বললেন, 'বৎস, চন্দ্রভাগাতীরে বনদেশে গিয়ে তুমি সূর্য আরাধনা কর। দ্বাদশবর্ষ সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করলে তুমি হবে রোগমুক্ত।' তাই হল। আর শাম্বের উপাসনাস্থলে নির্মিত হল প্রকাণ্ড এক সূর্যমন্দির। অরুণসারথি সপ্তাশ্বচালিত চক্রযানের আকৃতিতে গঠিত তার অবয়ব।

ইতিহাস অবশ্য অন্য কথা বলে। আজ থেকে আনুমানিক সাড়ে সাতশ বছর আগে এই মন্দিরের সূচনা। এ সম্বন্ধেও আছে রোমাঞ্চকর এক কাল্পনিক কাহিনী। প্রধান স্থপতির ওপর রাজনির্দেশ ছিল মন্দিরের চূড়ায় বসাতে হবে একটা ভারী চুম্বকখণ্ড। অপারগ হলে মৃত্যুদণ্ড। বার বছর চলল স্থপতিদের আমরণ প্রয়াস। কিন্তু প্রধান স্থপতি হাল ছেড়ে দিয়েছেন, তাঁর বিশ্বাস সাফল্য তাঁর নাগালের বাইরে। এমন সময়ে এল দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক একটি বালক। অপরিচিত বালককে প্রধান স্থপতি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? সে জবাব দিল সে প্রধান স্থপতির পুত্র। পিতাপুত্রে সেই প্রথম পরিচয়। পিতা পুত্রকে বললেন তাঁর ব্যর্থতার কাহিনী। এদিকে বার বছর ধরে পুত্র পিতার অনুপস্থিতিতে মার কাছে স্থপতিবিদ্যা আয়ত্ত করেছে। সব শুনে সে খানিকক্ষণ ভাবল। আর অচিরেই চুম্বকস্থাপনের সমস্যা সমাধান করল। কিন্তু মন্দির সম্পূর্ণ হওয়ার শুভমুহূর্তে সে সাগরে ঝাঁপ দিয়ে জীবন বিসর্জন দিল। পিতার গৌরবে হাত বসাতে সে প্রস্তুত ছিল না।

আত্মবিসর্জনের অশ্রুতে সিঞ্চিত এ মন্দির হলেও হতে পারে। কিন্তু আজ যদি এ মন্দির দেখে ইতিহাস অনুরাগীর চোখ আর্দ্র হয়ে ওঠে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

কোনার্কের সূর্যারতির ধ্বনি কালের যাত্রার ধ্বনিতে দিনে দিনে ক্ষীণ হয়ে আসছে। বিরাট স্থাপত্যকীর্তি আজ প্রায় ভগ্নস্তূপ। বিশ্বামিত্র মেনকা আজও দৈহিক ক্ষমতার অসম্ভাব্য নিদর্শনস্বরূপ রমণরত। কিন্তু ভেঙে পড়েছে অন্য অনেক মিথুনমূর্তি। অলস কন্যারা আজ বিস্মৃতির অতল তলে হারিয়ে যাচ্ছে। যা ভেঙে যায়, ধসে যায়, তাকে ধরে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করছে মানুষ। কিন্তু কতটুকু মানুষের ক্ষমতা। মানুষই একদিন রচনা করেছিল এই বালি-পাথরের মহাকাব্য। আজ তাকে বাঁচিয়ে রাখার ক্ষমতা মানুষের নেই। ইতিহাস আজ সংস্কারের মূর্তি ধারণ করেছে।

নীলাঞ্জনের হঠাৎ ধ্যান ভঙ্গ হল। গরম সীসের মত কানে এল ক'টি কথা। বিশ্বামিত্রের উদ্দেশে ঈর্ষান্বিত এক আধুনিক যুবার টিটকিরি। "গুরু, আর কত দেখাবি।" লম্বা চুল, রোগাপ্যাঁটকা একটা ছেলে। কাঁধে ঝুলছে ক্যামেরা। পাথরের গায়ে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে অশ্লীল সম্ভোগচিত্র। নীলাঞ্জনের আকাশচারী দৃষ্টি নেমে এল বালুকাময় কাদামাটির দিকে।

পাথরের নরনারীর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে এসে নীলাঞ্জন তাকায় উপস্থিত রক্তমাংসের নরনারীর দিকে। প্রথমেই চোখে পড়ল রতি আর বিমলকে। আজ বিমলকে একটু বিচলিত দেখায়। মন্দিরগাত্রের রূপরস আর রতির দেহলাবণ্যের সহাবস্থানে তার ক্যামেরা একটু দোটানায় পড়েছে মনে হয়। রতির কিন্তু ওদিকে নজর নেই। ঐ মুহূর্তে তাকে আর ছলনাভরা ললনা মনে হয় না। মুখে তার একটা দৃঢ় সংকল্পের ছাপ। প্রতিটি শিল্পকর্ম সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। ভাবছে। কামকলার নিদর্শন দেখে অন্য অনেক মেয়ে লজ্জায় লাল হচ্ছে। কিংবা ছি ছি করে মুখ ঘোরাচ্ছে। রতির কিন্তু ওদিকেই মনোযোগ বেশী। হঠাৎ নীলাঞ্জনের চোখে ওর চোখ পড়ল। দেখল রতির চোখ দুটো ঝক ঝক করছে। তাতে সংকোচের লেশমাত্র নেই।

ঘুরে ফিরে হাঁপিয়ে পড়েছে নীলাঞ্জন। ঝাউগাছের ছায়ায় বসে লাঞ্চ প্যাকেটটা খুলল। শ্যামলী বিস্তর খাবার প্যাক করে দিয়েছে কিন্তু গলা ভেজাবার উপকরণ সঙ্গে কিছু নেই। শুধুমাত্র জল। স্যান্ডউইচে একটা কামড় দিয়ে চারদিকে তাকাল। দেখল রতি আর বিমল অল্প একটু দূরে লাঞ্চ করতে বসেছে। রতি লাঞ্চ বাস্কেট খুলে দুটো গেলাসে যা ঢালল তা দেখে নীলাঞ্জনের চোখ চকচক করে। ফেনা ওঠা সোনালী বীয়ার। দেখল বাস্কেটে বেশ কটি বোতল ঠাসা। আর একবার ওদিকে চোখ পড়তে দেখল রতি ওকে ডাকছে। ও অবাক হল। এগিয়ে গেল। রতি এক ঝিলিক হাসি দিয়ে বলল, "কি ওখানে একা একা বসে খাচ্ছেন। আসুন এক সঙ্গে গল্প করতে করতে খাওয়া যাক। এ কদিনে কথা বলার সুযোগ হয় নি। আমরা সবাই সবার নাম জানি। ইন্ট্রোডাকশনের কি দরকার?"

নীলাঞ্জন মাথা চুলকে বলল, "বিমলবাবু তো কিছু বল্লেন না।"

বিমল এক মনে মন্দিরের দিকে তাকিয়েছিল। ধড়মড় করে উঠে বসে বলল,

"কি যে বলেন। আপনার সঙ্গে গল্প করার সুযোগ আমার সৌভাগ্য। আপনার কিছু কিছু লেখা আমি পড়েছি। আসুন, চলে আসুন।"

নীলাঞ্জন এসে ওদের সঙ্গে গুছিয়ে বসল। ওর দিকে তাকিয়ে জিভ দিয়ে চুক চুক শব্দ করে রতি বলে ঃ "এ কি নীলাঞ্জনবাবু। আপনার মত রসিক লোক এই সুন্দর জায়গায় বসে শুধু জল খাচ্ছেন। আসুন, বীয়ার চলবে তো, ঠাণ্ডা নয় কিন্তু।"

নীলাঞ্জন ঃ আপনার অশেষ করুণা।

রতি ঃ দেখবেন আবার। আপনার স্ত্রীর কাছে যেন গালমন্দ না শুনি। শুনেছি উনি আপনাকে খুব কড়া নজরে রাখেন। উনি এলেন না কেন?

নীলাঞ্জন ঃ না না, আমাকে তরল পথে চালু করতে পার্সুয়েশন তেমন লাগে না শ্যামলী জানে। আর আসলে ও খুব কড়া নয়। থাকলে ওর ভালই লাগত। হঠাৎ শরীরটা কাহিল হয়ে পড়ায় আসতে পারল না।

রতি ঃ একদিক দিয়ে আমার, আমাদের লাভ। দোকলা থাকলে কি আর ডাকতে সাহস হত!

নীলাঞ্জন ঃ একদম বাজে কথা। আমাদের গা থেকে বিয়ের গন্ধ ধুয়ে মুছে গেছে অনেক দিন। বরং আপনাদের দুজনেরই এখন থ্রি ইজ এ ক্রাউড মনে হবার কথা।

বিমল চুপ করে ছিল। এবার মুখ খুলল। "আচ্ছা, নীলাঞ্জনবাবু, আপনি তো অনেক জানেন। আপনার কি মনে হয় না, দুজনের ভালবাসা যতই গভীর হোক না কেন, দুজনে দুজনকে নিয়ে কখনই বেশী সময় কাটাতে পারে না। সে সান্নিধ্য শীগ্গিরই বিষিয়ে যায়।"

"দেবারতি দেবী, আপনি কি বলেন?" নীলাঞ্জন বলটা রতির কোর্টে ছুঁড়ে দিল।

রতি বলে "নীলাঞ্জনবাবু, আপনি আমার থেকে বয়সে বেশ কিছু বড়। আর আপনি তো আমাকে আগে থেকেই চেনেন। মনে নেই, সেই দেবেশদা আমাদের আলাপ করিয়ে দিয়েছিল ক'বছর আগে? আপনি আমাকে রতি বলে ডাকবেন, সকলেই তাই ডাকে। আর দেবা যখন বাদ, দেবীই বা থাকবে কেন?"

নীলাঞ্জন রতির বুদ্ধির তারিফ করে মনে মনে। ইংরেজীতে যাকে বলে ব্রেজেনিং ইট আউট। পূর্ব পরিচয় সম্বন্ধে নীলাঞ্জন কোন কথা বলে না। শুধু বলল, "আপনার মতামতটা কিন্তু জানা হল না।"

রতি ঃ দেখুন, আমি যে কখনও এ নিয়ে বিশেষ ভেবেছি তা নয়। কিন্তু আজ কোনার্কের মন্দিরগাত্রে যে জীবনের ছবি দেখলাম ভাবতে ইচ্ছে করছে। সব মানুষের ভেতরই একটা অংশ একা এবং একাকী। আর আর একটা অংশ পরস্বগ্রাসী। এই যে দুজনার মিলন যা নিয়ে এত কাব্য সাহিত্য তাতেও বোধহয় সেই একে অপরকে দখল করে নেওয়ার একটা গোপন আকাঙ্ক্ষা কাজ করে। তারপর আসে সেই অধিকারকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে নেওয়ার চেষ্টা। কিন্তু তাই বলে কি পরস্বগ্রাসের অদম্য লিপ্সা একেবারে ফুরিয়ে যায়। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের বাইরে নারী-পুরুষের প্রতিটি আদান-প্রদান—কথায়, হাসিতে, প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে, সেই জয় করার নেশা। আজকের পৃথিবীতে আমরা তাতে বল্গা পরিয়ে

রাখি। কিন্তু দেখুন, এ মন্দিরে যে নরনারীর ছবি আঁকা তাদের ওরকম শৃংখল ছিল না। তারা ছিল মুক্ত পুরুষ, মুক্ত নারী। তাই দুই বা ততোধিক নারী অসংকোচে একই পুরুষের সঙ্গে একই সময় বিহার করতে পারত। পুরুষের বেলাও তাই। এই মুক্তপ্রকাশে যে স্বভাব ফুটে ওঠে, তার থেকে আমাদের স্বভাব সত্যি কি কিছু বদলেছে?

নীলাঞ্জনঃ শৃংখল হয় তো খানিকটা আমরা পরেছি। কিন্তু তাতে কি শৃংখলা বাড়েনি? আর একটা কথা। আমার তো মনে হয় না আজকের দিনের নরনারী কোন মুক্তস্বরূপের সন্ধানে শৃংখল ভাঙে। শৃংখল ভাঙে বোরডম থেকে। এ কথাটার বাংলা প্রতিশব্দ বোধ হয় নেই।

রতিঃ কিন্তু আপনি কি মনে করেন শৃংখল ভাঙাটা সাংঘাতিক বড় কিছু একটা অপরাধ? মানুষ তো আরও কত বড় অপরাধ করে। সে অপরাধ কখনও কখনও আত্মপক্ষ সমর্থনে শৃংখলারক্ষার জন্য সে কথা সে বলার চেষ্টা করে। আপনি তো সাংবাদিক মানুষ। কত বড় বড় নামী লোকের জীবনের নাড়িনক্ষত্র আপনার জানা। তাই বলে কি আপনি কারুর ছোটখাটো শৃংখল ভাঙার নজির নিয়ে হাটে হাড়ি ভাঙবেন? বলবেন সবই শৃংখলার খাতিরে। সেটা কি আরও অনেক বড় অপরাধ না। সেটাকে কি এক ধরনের ব্ল্যাকমেইল বলা ভুল হবে? নাই বা রইলো তাতে টাকা আনা পয়সার প্রশ্ন।

এতক্ষণে, নীলাঞ্জন মনে মনে কহিলা বিষাদে, বুঝিনু কেন মোরে ডাকা।

বিমলঃ তোমরা কি ছাইপাশ বকছ। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। বীয়ারের ঘোর এল নাকি তোমাদের? আমি শুধু বলেছিলাম একা একা দুজনের সময় কাটানোর মত বিচ্ছিরি জিনিষ আর কিছু নেই। আপনার সঙ্গে আলাপ করার চান্স পেয়ে নীলাঞ্জনবাবু তাই হঠাৎ খুব আহ্লাদ হয়েছিল, সত্যি বলছি। কিন্তু রতি যে কি বলতে কি বলা শুরু করল আমার সব গুলিয়ে গেল।

নীলাঞ্জনঃ তাতে কি হয়েছে বিমলবাবু। কাল তো নিরবধি। পরে একদিন আপনার সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা দেওয়া যাবে। এখন উঠুন, ঐ আমাদের চার চাকার রথ ভেঁপু বাজাচ্ছে।

কোনার্কের পর যাওয়া হল ধৌলাগিরিতে।

শান্তির পীঠস্থান ধৌলাগিরি। কলিঙ্গ যুদ্ধের শেষে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে ক্লান্ত সম্রাট অশোক এইখানে দেখলেন নদীর অপর তীরে রাজা শিশুপালের পরাজিত সেনাবাহিনীর বিধ্বস্ত রূপ। মহাপরাক্রান্ত নরপতি আত্মগ্লানিতে জর্জরিত। স্থির করলেন তাঁর রাজ্যে রণদুন্দুভি আর বাজবে না। বাকী জীবন তিনি উৎসর্গ করলেন প্রজাকল্যাণের উদ্দেশে। দীক্ষা নিলেন ভগবান তথাগতের অহিংসা মন্ত্রে। পাত্রমিত্র অমাত্য দেশে বিদেশে ছড়িয়ে দিল শান্তির ললিতবাণী। আজ সর্ব-বিধ্বংসী কালের আক্রমণে মহামতি অশোকের কীর্তি লুপ্তপ্রায়। কিন্তু শান্তির নতুন সৌধ তৈরী করেছে, বিশ্ব বৌদ্ধ সংস্থা। পাহাড়চূড়ায় শ্বেতকপোতের মত এই স্তূপ। তার জঠর থেকে সতত নির্গত হচ্ছে শান্তির গম্ভীর নিনাদ। নীচে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। অদূরে নবীন নগরী ভুবনেশ্বর। স্তূপ সমীপবর্তী সোপানে আরোহণ করতে করতে নীলাঞ্জনের মনে আসে মৈত্রীর উচ্ছ্বাস।

হাসি মুখে নীলাঞ্জন এগিয়ে যায় মিস্টার চ্যাটার্জির দিকে। ভদ্রলোকের

প্রথম কথায় মানুষটাকে হঠাৎ ভাল লাগে। প্রিয়ব্রতবাবু বল্লেন, 'স্যার আমার কাজ তো শুধু মুখস্থ বলা। দু-দুবার স্ট্রোক হয়ে গ্যালো। তবুও লেগে রয়েছি।' নীলাঞ্জন অবাক হয়। বলে, "দুটো স্ট্রোকের পর সারাদিন বকবকানির কাজ। এটা কি আপনার ঠিক হচ্ছে।" উত্তরে মিঃ চ্যাটার্জি আবার একটু নিজেকে জাহির করার চেষ্টা করেন। "বাজে আড্ডা দিতে ভাল লাগে না। তাই এই সব সীরিয়াস টপিক্স নিয়ে মাথা ঘামাই।" সিগারেটটাকে হাতের মুঠিতে চেপে ধরে গাঁজার টান দেন প্রিয়ব্রতবাবু। নীলাঞ্জনের বাজে লাগে। কোন্ কথাতে খুঁজে পাওয়া যায় রতির ভাষায় মিঃ চ্যাটার্জির মুক্তস্বরূপ, সে বুঝতে পারে না।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে রতির সঙ্গে চোখাচোখি। ওর লাঞ্চ টাইমের চালাকিতে নীলাঞ্জন খানিকটা বিরক্ত হয়েছিল। এখন ওর সরল উচ্ছল হাসিতে তার মনের মেঘ সরে গেল। কাছে গিয়ে বলল, "কেমন লাগছে জায়গাটা। বেশ শান্ত সমাহিত ভাব, তাই না?"

হঠাৎ হাসতে গিয়ে রতি উপ্স্ বলে পা হড়কে এক ধাপ গড়িয়ে গেল। টাল সামলাবার জন্য নীলাঞ্জনের হাতটা চেপে ধরল। তারপর খানিকক্ষণ ওর হাতটা চেপে ধরেই রইল। মুখে রক্তোচ্ছ্বাস। নীলাঞ্জন ক্ষণিক সম্মোহিত। রতি ভ্রূ-ভঙ্গিমা করে বলল, "মাঝে মাঝে শৃঙ্খল খোলা ভাল, তাই না মিঃ জার্নালিস্ট।"

১১

পরদিন সকালে জানা গেল রতি চ্যাটার্জি হঠাৎ মারা গেছেন।

সকালে খাবার ঘরে সবাই প্রাতরাশ করতে বসেছে। আজ একটু বেলায় নেমেছে অনেকে। কাল কোনার্ক দর্শনে বেশ ধকল গেছে। হঠাৎ নীলাঞ্জন দেখে গোপাল নামে সেই ছেলেটা ছুটতে ছুটতে ম্যানেজারের ঘরে গেল। তার মুখটা একেবারে শুকনো, ফ্যাকাশে। চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসছে। ম্যানেজারকে সে হাত নেড়ে নেড়ে কি সব বলল। ম্যানেজার খানিকক্ষণ একেবারে পাথরের মত বসে রইলেন: তারপর আস্তে আস্তে টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ালেন।

নীলাঞ্জন কাপে খানিকটা কফি ঢেলে বলল, "কিছু একটা হয়েছে মনে হচ্ছে শ্যামলী।" ওর চোখ গেল কোণের দিকের একটা টেবিলে। বিমলবাবু একা একা বসে আছেন। কেমন ঝোড়ো কাকের মত চেহারা।

শ্যামলী গা করে না। বলে, "এই ফাঁকা জায়গায় হবেটা আর কি? বড় মাছ-টাছ ধরা পড়েছে কিছু হয় তো।"

নীলাঞ্জন ম্যানেজারের ঘরের দিকে তাকায়। ওঁর টেলিফোনে কথা বলা শেষ হয়েছে। উঠে দাঁড়িয়ে উনি এদিকেই আসছেন।

বেশ খানিকক্ষণ আমতা আমতা করার পর ম্যানেজার সবাইকে যা বললেন তার সারমর্ম হল এইঃ সকালবেলা গোপাল সমুদ্রের পাড়ে ঝাউবনের কাছে একটা মৃতদেহ দেখতে পায়। মৃতদেহের ও যা বর্ণনা দিচ্ছে তা থেকে ম্যানেজারের অনুমান মিসেস দেবারতি চ্যাটার্জির আকস্মিক মৃত্যু ঘটেছে। বিমলবাবু কি দয়া করে তার সঙ্গে গিয়ে মৃতদেহ সনাক্ত করবেন।

বিমল ডুকরে কেঁদে ওঠে, "আমি জানি নিশ্চয়ই রতি। কাল রাতে সেই যে একটু হাওয়া খেয়ে আসি বলে বেরিয়ে গেল আর ফিরে আসেনি।"

চারদিকে সোরগোল পড়ে গেল। সিংজীকে দেখা গেল হঠাৎ যেন একেবারে চুপসে গেছেন। এই মুহূর্তে তাঁকে ঊনসত্তরের থেকে একদিনও কম বয়স মনে হচ্ছিল না। তিনি ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করলেন, "এই দুর্ঘটনার জন্য আমাদের প্রোগ্রাম কিছু বদলাতে হবে না তো। আমি আজই দিল্লি যাব ভাবছিলাম।"

ম্যানেজার বিনীতভাবে বললেন, "একটু অসুবিধে আছে। আমি পুলিশে খবর দিয়েছি। ওরা এক্ষুনি চলে আসবে। পুলিশ না আসা পর্যন্ত আপনাদের ধৈর্য ধরে একটু এই ঘরেই অপেক্ষা করতে হবে। শুধু বিমলবাবু কাইণ্ডলি আমার সঙ্গে আসুন।"

ডাইনিং রুমে সকালের স্বচ্ছ আলোয় একটা ভয়ঙ্কর কালো ছায়া নেমে এল।

সহসা দীর্ঘ অবসরের অখণ্ড শান্তি টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ল। মৃত্যু-মাত্রই ভয়াবহ, বিশেষ করে আকস্মিক মৃত্যু। কিন্তু পুলিশ কেন? তার মানে কি খুন? কে খুন করল? তাদের মধ্যে কেউ একজন নয় তো? পুলিশ কি তা হলে তাদের নজরবন্দী করে রাখবে? প্রশ্নবাণে নাজেহাল করবে? তাদের কি থানায় যেতে হবে? নীলাঞ্জন সাংবাদিক। অনেকেই তাকে জিজ্ঞেস করল কি হবে। নীলাঞ্জন গম্ভীর মুখে বলে অস্বাভাবিক মৃত্যু যখন তখন করোনারের কোর্ট পর্যন্ত তো নিশ্চয়ই গড়াবে।

জীপের শব্দে সবাই সচকিত হয়ে উঠল। ঘরে ঢুকলেন একজন দশাসই ভদ্র-লোক। দেখেই বোঝা যায় তিনিই হবেন কর্ণধার। ম্যানেজার পরিচয় করিয়ে দিলেন ইনি মিঃ পট্টনায়ক। নামী পুলিশ ইন্স্পেক্টার। উনি আপনাদের সঙ্গে দেবারতি দেবীর মৃত্যু নিয়ে কিছু কথা বলবেন। হ্যাঁ, দেবারতিদেবীই মারা গেছেন।

নীলাঞ্জন কৌতূহলী চোখে ইন্সপেক্টর পট্টনায়ককে দেখে। দিশী-বিদেশী সব খুন-খারাপির গল্পেই পুলিশ অফিসারকে একটা জরদ্গব জীব বানিয়ে দেওয়া হয়। শখের গোয়েন্দার বুদ্ধির কাছে সে প্রতিপদে পরাজিত। একমাত্র ব্যতিক্রম বোধহয় ইন্সপেক্টর মেইগ্রে। পট্টনায়ককে দেখলে কিন্তু মেইগ্রের সঙ্গে কোন তুলনা মনে আসার কথা নয়। বরং হেমেন রায়-এর সুন্দরবাবুর কথাই মনে আসতে পারে। ইন্সপেক্টার পট্টনায়ক অবশ্য হুম জাতীয় একটা শব্দ করলেন না কিংবা খানাঘরে বসে ডিমের পোচ আক্রমণ করলেন না। ম্যানেজারের সঙ্গে হাসি মুখে খানিকক্ষণ কথা বললেন। ওদিকে দ্রুতগতিতে ম্যানেজারের অফিস ঘরটা থেকে কাগজপত্র সব সরিয়ে পরিষ্কার করে ফেলা হল। ইন্সপেক্টার সাহেব সেখানে গিয়ে বসলেন। প্রথমেই নামের রেজিস্টারটাতে চোখ বোলালেন। তারপর একজনের পর একজনকে ডেকে পাঠালেন।

শ্যামলীর মুখটা একেবারে শুকিয়ে গেছে। নীলাঞ্জনের দেখে কষ্ট হয়। নিজেকে অপরাধী মনে হয়। বেচারীর বেড়াতে এসে এ কি দুর্ভোগ। একটু হুইস্কি খেলে ভাল লাগত। নার্ভটা স্টেডি হত। কিন্তু পুলিশী তদন্তের সময় মদ না খাওয়াই ভাল। মাথাটা খুব পরিষ্কার রাখতে হবে। সাফ সাফ জবাব না দিতে পারলে টানা হ্যাঁচড়ার আর অন্ত থাকবে না।

পট্টনায়ক নীলাঞ্জন আর শ্যামলীকে তার লিস্টের একেবারে শেষে রেখেছে। নীলাঞ্জন একজনের পর একজনকে ওর ঘরে যেতে দেখে। যাবার সময় বধ্যভূমিতে বলির পশুর মত ভয়ার্ত চেহারা। বেরিয়ে আসছে যখন প্রত্যেকের মুখে সাময়িক অব্যাহতির হাসি। অবশেষে ওদের দুজনের ডাক এল।

ওরা ঘরে ঢোকামাত্র ঝানু অফিসার পট্টনায়ক অমায়িক হাসি হাসলেন। বললেন, "কি কাণ্ড বলুন তো। এমন সুন্দর পরিবেশে এ রকম বিচ্ছিরি একটা ব্যাপার।"

নীলাঞ্জন সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করে। বলে, "বিপদ বলতে বিপদ। এলাম সমুদ্রের হাওয়া খেয়ে স্বাস্থ্য ফেরাতে। আর এখন দেখুন কি হাঙ্গামায় পড়তে হল। শেষ পর্যন্ত সস্ত্রীক পুলিশকাছারি।"

পট্টনায়কঃ আচ্ছা নীলাঞ্জনবাবু। আপনি তো সাংবাদিক মানুষ, নীলাঞ্জন

গুপ্ত নামটা আমার কাছে নেহাৎ অপরিচিত নয়। ভালই হয়েছে একদিক দিয়ে আপনি এখানে। আমরা মাথা মোটা পুলিশের লোক। আপনার সঙ্গে খোলা-খুলি সব আলোচনা করলে আমারই লাভ হবে। আপনার বুদ্ধি আর যুক্তি সত্যি আমাকে অনেক হেলপ করতে পারে।

নীলাঞ্জনঃ আমিও পুরোপুরি খোলাখুলি আলোচনার পক্ষপাতী। কিন্তু শখের গোয়েন্দাগিরিতে আমার তালিম দেওয়া নেই। তবু যেটুকু পারি নিশ্চয়ই আপনাকে সাহায্য করব।

পট্টনায়কঃ দেখুন তা হলে ব্যাপারটা আপনাকে সোজাসুজি বলি। দেবারতি-দেবীর মৃত্যুটা দুর্ঘটনা সাব্যস্ত হলে আমার চেয়ে খুশী আর কেউ হবে না। ঝক্কি কমে যায় কত। কিন্তু তা বোধহয় না। আত্মহত্যাও কেন জানি মনে হচ্ছে না। পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা না পাওয়া পর্যন্ত সঠিক কিছু বলতে পারছি না। পনের আনা সম্ভাবনা দেবারতিদেবী কারও হাতে খুন হয়েছেন। হ্যা, আমার বিশ্বাস একটা খুন হয়েছে এখানে কাল রাতে। আর কিছুই খোয়া যায়নি। চোর ডাকাতের কাজ মনে হয় না।

নীলাঞ্জনঃ খুন বলেই আপনি ধরে নিচ্ছেন কেন জানতে পারি কি?

পট্টনায়কঃ নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। বলতে কোনই আপত্তি নেই আমার। ইন ফ্যাক্ট আপনার সঙ্গে আমার ধারণাটা চেক করে নিতেই চাইছিলাম। দেখুন, দেবারতিদেবী যদি দুর্ঘটনায় সমুদ্রে ডুবে যেতেন, কিংবা সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতেন তা হলে কি হত? তা হলে কি মৃতদেহ আজ সকালেই ভেসে এসে ঝাউবন বরাবর পেঁছিতে পারত? নো, দ্যাটস্ কোয়াইট ইমপসিবল। পাড়েই বালির মধ্যে পড়ে থাকত। তা ছাড়া, বেশ খানিকক্ষণ একটা মৃতদেহ সমুদ্রের নোনা জলে ভাসলে শরীরে কিছু চিহ্ন পড়বেই। সে রকম কিছু তো আমার চোখে আসে নি। শরীরটা জলে ভেজা ছিল ঠিকই। কিন্তু কাল শেষ রাতে খুব বৃষ্টি হয়েছে। আমার মনে হচ্ছে মৃতদেহ বৃষ্টির জলেই ভিজেছে।

নীলাঞ্জনঃ ইউ হ্যাভ এ পয়েন্ট দেয়ার।

পট্টনায়কঃ তা হলে মনে হচ্ছে দেবারতিদেবী ডাঙাতেই মারা গেছেন। জলে তিনি আদৌ যাননি। ডাঙায় দাঁড়িয়ে কোন আকস্মিক দুর্ঘটনা হবার সম্ভাবনা ওর ক্ষেত্রে ছিল না বললেই চলে। সুস্থ সবল মহিলা। ওর বয়সে স্ট্রোকট্রো হবার কথা নয়। তা হলে কি দেবারতিদেবী আত্মহত্যা করেছেন? কিন্তু ঝাউবনের পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি আত্মহত্যা করলেন কি করে? বিষ খাওয়ার ইচ্ছে থাকলে ঠিক ওখানে গিয়ে তা খেতে যাবেন কেন? আর এনি ওয়ে পোস্টমর্টেম রিপোর্টেই জানা যাবে ওঁর শরীরে কোন বিষক্রিয়া হয়েছে কি না। আমার মতে আত্মহত্যার সম্ভাবনাটাও মোটামুটি বাদ দেওয়া যেতে পারে।

নীলাঞ্জন শুকনো মুখে পট্টনায়কের দিকে চেয়ে থাকে। একবার আড়চোখে শ্যামলীকে দেখে নেয়। মনে হয় ও ঘুমিয়ে পড়েছে।

পট্টনায়কঃ তা হলে বাকী থাকে হত্যা। দেবারতিদেবীর শরীরে খালি চোখে কোন আঘাতের চিহ্ন ধরা পড়ে নি। কোন ভারী জিনিস দিয়ে ওকে আঘাত করা হয় নি। ওকে আমার মনে হয় অতর্কিতে শ্বাসরোধ করে মারা হয়েছে।

নীলাঞ্জন মনে মনে পট্টনায়কের যুক্তির তারিফ করে। কোথাও কোন ফাঁক

নেই। সে বলল, "আচ্ছা, গলা টিপে ওকে মারা হলে ওর গলায় কি হত্যাকারীর ফিংগারপ্রিন্টস পাওয়া যাবে না?"

পট্টনায়কঃ আপনার মত বুদ্ধিমান লোকের কাছে এরকম কথা আশা করিনি। প্রথমত গলা টিপে মারতে হাত ব্যবহার করতে হবে এমন কোন কথা নেই। মিসেস চ্যাটার্জির পরনে একটা কাল ওড়না ছিল। ওটা দিয়ে অনায়াসে ওর শ্বাসরোধ করা সম্ভব। তা ছাড়া কোন ফিংগারপ্রিন্টস থেকে থাকলেও শেষ রাতের প্রবল বর্ষণে সব ধুয়ে মুছে যাবার কথা।

নীলাঞ্জনঃ দুর্ভাগ্যবশত আপনার সঙ্গে একমত না হয়ে পারছি না। তা আমার কাছ থেকে আপনি কি জানতে চান বলুন।

পট্টনায়কঃ কিছু রুটিন প্রশ্ন ছাড়া আপনাদের দুজনকে আপাতত আমার কিছু জিজ্ঞেস করার নেই। শুধু কাল গোটা দিনে আপনাদের মুভমেন্টসটা...

নীলাঞ্জনঃ কাল আমার স্ত্রীর শরীর খুব খারাপ হয়েছিল। তাই তিনি আমার সঙ্গে বেরোননি। সারাদিন ঘরেই ছিলেন। বেয়ারা ঘরে খাবার দিয়ে যায়। আমি বাসে করে একটা কন্ডাকটেড ট্রিপ-এ যাই। কোনার্কের মন্দিরের কাছে আমার সঙ্গে বিমলবাবু আর দেবারতিদেবীর দুজনেরই দেখা হয়। আমরা এক-সঙ্গে বসে লাঞ্চ খাই। ধৌলিগিরিতে আবার একবার দেবারতিদেবীর সঙ্গে কথা হয়।

পট্টনায়কঃ ফিরে এসে রাতে কি করলেন?

নীলাঞ্জনঃ আমার সন্ধ্যের দিকে একটু ড্রিংক করার অভ্যেস। দু তিন পেগ খাবার পর আমি ডিনার খাই। ডাইনিং রুমে বিমলবাবু কি দেবারতিদেবী কাউকেই দেখিনি। তারপর বেশ কিছুক্ষণের জন্য সমুদ্র তীরে বেড়াতে যাই। আমি বেলাভূমির যে-দিকটায় হাঁটছিলাম সে-দিকটা একেবারে নির্জন ছিল কাল রাত্রে। একে বৃষ্টির আভাস ছিল বাতাসে। বেশ ঠান্ডা ঠান্ডা লাগছিল। তার ওপর আবার কাল ছিল অমাবস্যা। ঘুটঘুটে অন্ধকার। বীচের এখানে সেখানে অন্য কেউ থাকলে আমার পক্ষে দেখা সম্ভব ছিল না। তবে ডিনারের পর এখানে অনেকেই বেড়াতে বেরোন। সঙ্গে টর্চ থাকলে অন্ধকারে বিশেষ যায় আসে না।

পট্টনায়কঃ এই কেসে অ্যালিবাই-এর ওপর কোন জোর দেওয়া যাবে বলে মনে হচ্ছে না। কাল রাতে এখানকার অনেকেই অল্প-বেশী সময়ের জন্য সী-বীচে ছিলেন। আর কারও সঙ্গে অন্য কারও গল্পগুজব হয়েছিল কি না জানা যায়নি। যে কেউ যে কোন সময় দেবারতিদেবীকে খুন করতে পারত। আবার গোপাল ছেলেটাকেও একেবারে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যায় না। কাল রাতে ও নাকি মদ খেয়ে এই পান্থশালায় এসেছিল আর খুব বদমেজাজ নিয়ে সী-বীচের পথেই ফিরে যায়।

নীলাঞ্জনের মাথায় হঠাৎ গোয়েন্দাগিরির ভূত চেপে বসল। বলল, "মিঃ পট্টনায়ক, দেবারতিদেবী যদি সত্যি খুন হয়ে থাকেন, তবে আপনার বোধ হয় উচিত খুনের একটা মোটিভ খুঁজে বের করা। অপরচুনিটি তো আপনি বলছেন প্রায় সকলেরই ছিল। অবশ্য এটা যদি কোন হমিসাইডাল মেনিয়াক বা সেক্স কিলার-এর কাজ হয় তা হলে অন্য কথা। কিন্তু এটা যদি ভেতরকার ক্রাইম হয়, যদি পূর্বপরিকল্পিত হয় তবে মোটিভই আপনার অনুসন্ধানের পথ দেখাবে।

আর আমার পুঁথিগত বিদ্যা বলে মোটিভ খুঁজে বের করার একমাত্র উপায় হল নিহত ব্যক্তির পূর্বজীবন ঘেঁটে দেখা। যে কোন খুনের রহস্যের সমাধান ভিকটিম-এর সাইকলজির মধ্যেই নিহিত থাকে।"

ইন্‌স্পেক্টার পট্টনায়ক মৃদু হাসলেন। বললেন, "পুঁথিগত বিদ্যা একেবারে ফেলনা ব্যাপার নয় এটুকু বুদ্ধি আমার আছে। আমি নিশ্চয়ই এ লাইনে তদন্ত চালাব। একটা কথা, বিমলবাবু তার স্টেটমেণ্ট-এ বললেন, কোনার্কে লাঞ্চ করতে করতে মিসেস চ্যাটার্জি বলেছিলেন আপনাদের আগের থেকে জানাশোনা ছিল। ব্যাপারটা কি বলুন তো?"

নীলাঞ্জন খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। দেবারতির ব্ল্যাকমেইল সম্বন্ধে বক্রোক্তিটা মনে এল। তারপর নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল, "ও কিছু নয় ইন্‌স্পেক্টার। নিছক মেয়েলি তিলকে তাল বানান। পূর্বপরিচয় তেমন কিছু ছিল না। একবার জলপাইগুড়ির কাছে একটা ফরেস্ট বাংলোয় অল্পক্ষণের জন্য পরিচয় হয়েছিল। ওর সঙ্গে ছিল ওর এক আত্মীয় দেবেশ রায়। আমার সঙ্গে বিলেতে পড়াশুনো করেছে। সেই আলাপ করিয়ে দিয়েছিল।"

পট্টনায়কঃ তা দেবেশবাবু এখন কোথায়?

নীলাঞ্জনঃ ও বেশ ক'দিন দেশ ছাড়া। এখন ঠিক কোথায় আছে বলতে পারব না।

পট্টনায়কঃ আচ্ছা, আজ তবে এই পর্যন্ত। আমি মাঝে মাঝে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব। ও যা, ভাল কথা। আপনার নিজের কাউকে সন্দেহ হয় কি?

নীলাঞ্জনঃ না।

তারপর দিন দুই পট্টনায়ক আর এলেন না। দ্বিতীয় দিন সন্ধ্যেবেলায় একজন কনস্টেবল নীলাঞ্জনের জন্য একটা চিঠি নিয়ে এল। পট্টনায়কের চিঠি।

"মিঃ গুপ্ত,

পোস্টমর্টেম রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে জলে ডুবে মৃত্যুর কথা উঠতেই পারে না। তা ছাড়া বিষক্রিয়ার কোন এভিডেন্স নেই। দেহে কোন আঘাতের চিহ্নও নেই। আমার অনুমানই ঠিক। ইট্‌জ এ কেস অব ডেথ বাই একসফিক্সিয়েশন। আমি একটু খোঁজ খবর করতে কলকাতা যাচ্ছি। আপনাকে শুধু রিপোর্টের খবরটা জানালাম। খুন এ বিষয়ে আর কোনও সন্দেহ নেই। আপনি আপনার সেই যে পোয়ারো সাহেব বলতেন লিট্‌ল গ্রে সেল সেগুলো কাজে লাগান। ফিরে এসে আপনার কাছে সাহায্য চাইব বোধহয় আবার।

—ইতি

অনন্ত পট্টনায়ক"

দিন চারেক বাদে সন্ধ্যেবেলা পান্থশালায় পট্টনায়ক এসে হাজির। ওকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। এসেই নীলাঞ্জনকে ডেকে পাঠালেন। নীলাঞ্জন সবেমাত্র হুইস্কির গেলাসে চুমুক দিয়েছে। পট্টনায়ক বললেন, "যান আপনার ড্রিংকটা নিয়েই আসুন। আমিও একটু গলা ভেজাতে পারলে খুশী হতাম। কিন্তু অন ডিউটি ওটা আমি করি না। ফোর্সে অনেকে করেন। আমি এতদিন এড়িয়ে যেতে পেরেছি।"

নীলাঞ্জন গেলাসে চুমুক দিয়ে বলল, "তারপর, কি খবর ইন্‌স্পেক্টার সাব? কলকাতাতে গিয়ে কি অমূল্য তথ্য সংগ্রহ করলেন?"

পট্টনায়ক খানিকক্ষণ পেন্সিলটা নিয়ে টেবিলের ওপর টরে টক্কা করতে লাগলেন। একটু চিন্তান্বিত দেখাচ্ছে ওঁকে। বললেন, "খবর যা পেয়েছি তা তো আপনার অজানা হওয়ার কথা নয় গুপ্ত সাহেব। কেন আমার কাছে সেসব কথা ফাঁস করেন নি তাও যে বুঝি না তা নয়। কিন্তু বুঝলেন কিনা, খুনখারাপির ব্যাপার। এখানে ডিসেন্সি ফিসেন্সির বালাই থাকলে চলে না।"

নীলাঞ্জন কিছুই বলে না। শুধু গেলাসে আর একটা চুমুক দেয়।

পট্টনায়ক বলে চলেন, "আপনি তো জানেন মিসেস দেবারতি চ্যাটার্জি বিয়ের আগে যিনি রতি ব্যানার্জি বলে পরিচিত ছিলেন—সী ইজ অর রাদার ওয়াজ এ উয়ম্যান উইথ এ পাস্ট। এক সময় কলকাতায় মধুলোভীদের মহলে উনি ছিলেন মক্ষিরানী। আপনি ওই যে সেদিন বললেন ওর এক আত্মীয়ের কথা—আপনার বন্ধু দেবেশ রায়। আসলে আপনি তো জানেন আত্মীয় ফাত্মীয় কিসসু নয়। আর একজন মধুলোভী অ্যাডমায়ারার। আপনি নিশ্চয়ই জানতেন ওরা কেন জলপাইগুড়ির সেই ফরেস্ট বাংলোয় গিয়েছিল।

নীলাঞ্জনঃ অনেক খবরই তো যোগাড় করেছেন এ ক'দিনে দেখছি। আমি জানতাম ঠিকই। তবে শুধু শুধু পুরোনো কাসুন্দি ঘেঁটে কি হবে তাই কথাটা চেপে গিয়েছিলাম। এখন বুঝছি আপনার কথাই ঠিক। কাজটা ঠিক হয় নি। আফটার অল ইট্‌জ এ কেস অব মার্ডার।

পট্টনায়কঃ তা হলেই দেখছেন আমরা কোথায় এসে দাঁড়াচ্ছি। রতি ব্যানার্জির জীবন আর দেবারতি চ্যাটার্জির বাইরের পরিচয়ে বিস্তর ফারাক। দেবারতি চ্যাটার্জির জীবনে হয়তো ওর খুনের কোন মোটিভ খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু রতি ব্যানার্জির কথা আলাদা। ওর মত মেয়েদের জীবনের এ ধরনের পরিণতি একেবারেই আশ্চর্য হবার মত নয়। অবশ্য মোটিভের সম্ভাবনা এক জিনিস আর ঠিক কি মোটিভ এ ক্ষেত্রে কাজ করেছে তা সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। সত্যিকারের মোটিভটা যে কি হতে পারে তা স্বীকার করছি ঘুণাক্ষরেও টের পাইনি আজও। কিন্তু সম্ভাবনা অনেক।

ইন্‌স্পেক্টর পট্টনায়ক একটা কাল্পনিক গেলাসে হাত দিতে যান। সঙ্গে সঙ্গে ওঁর ভুল বুঝতে পেরে খানিকক্ষণ কপাল কুঁচকে থাকেন। তারপর বলেন, "দিন গুপ্ত সাহেব। আমাকেও এক পাত্র ঢেলে দিন। আমি তো ঠিক ডিউটিতে নই এখন।"

নীলাঞ্জন ইন্‌স্পেক্টারকে একটা ড্রিংক ঢেলে দেয়।

পট্টনায়ক আবার শুরু করলেন, "যা বলছিলাম, সম্ভাবনা অনেক। প্রথমেই ধরুন, ওর স্বামীর কথা। এমনিতে সাদামাটা লোক। আপাতদৃষ্টিতে স্ত্রীর মৃত্যুতে মুষড়ে পড়েছেন। কিন্তু ধরুন, উনি টের পেয়েছিলেন তাঁর স্ত্রীর পূর্ব-জীবনের কথা। তা হলে স্ত্রীকে হত্যা করার তার যথেষ্ট মোটিভ থাকতে পারে। ঈর্ষা, ক্রোধ, প্রতিহিংসা। আবার ব্ল্যাকমেইলের দিকটাও ভেবে দেখার মত। হয়তো কেউ জানত রতি ব্যানার্জির জীবনের কলঙ্কময় কাহিনী। স্বামীকে জানিয়ে দেবে এই ভয় দেখিয়ে ওর কাছ থেকে মোটা টাকা আদায়ের চেষ্টা করা কিছুই

অস্বাভাবিক নয়। আর তা নিয়ে মিসেস চ্যাটার্জির সঙ্গে সে রাত্রে কিছু কথা কাটাকাটি, একটু ধস্তাধস্তি হয়ে থাকতে পারে হয়তো। হঠাৎ রেগে গিয়ে মিসেস চ্যাটার্জিকে ব্ল্যাকমেইলার হত্যা করতে পারে। কিন্তু দুটো আপত্তি আছে এই থিয়োরিতে। প্রথমত ব্ল্যাকমেইলারেরা সাধারণত তাদের জাল ফেলার এত গোড়ার দিকে ভিকটিমকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয় না। সেটা তবুও হয়তো সম্ভব। কিন্তু বেশী খটকা লাগে আর একটা ব্যাপারে। যতদূর মনে হয়, মিসেস চ্যাটার্জিকে তার নিজের ওড়না দিয়ে ফাঁস লাগান হয়। একজন সাধারণ ব্ল্যাকমেইলারের পক্ষে সেটা সম্ভব হবার কথা নয়। সেখানে আর একটা সম্ভাবনা উঁকি দেয়। বিশেষ করে রতিদেবী যে টাইপের মেয়ে ছিলেন, সহজেই একটু প্রেম প্রেম খেলার কথা মনে আসে।

নীলাঞ্জন খানিকক্ষণ কি যেন ভাবে। তারপর জিজ্ঞেস করে, "আচ্ছা আমাদের মধ্যে কাকে ঠিক এই ব্ল্যাকমেইলারের রোলে ফেলা যায় বলে আপনার মনে হয়? কিছু ভেবেছেন কি?"

পট্টনায়ক ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। আস্তে আস্তে বলেন, "একেবারে যে ভাবিনি তা নয়। তবে খুব তলিয়ে দেখিনি। আপাতদৃষ্টিতে শুধু একজনকেই সন্দেহ করা চলে। সে হল আপনি।"

নীলাঞ্জন স্বভাবসুলভ বাঁকা হাসি হাসে। বলে, "এ রকম কিছু একটা বলবেন সন্দেহ হচ্ছিল। তা কি করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন পট্টনায়ক সাহেব?"

পট্টনায়ক আবার ওর দিকে তাকান। ঈষৎ তির্যকদৃষ্টি। "ব্যাপারটা অমন হেসে উড়িয়ে দেবেন না। আপনাকে সন্দেহ করার একাধিক কারণ দেখাতে পারি। যেমন আপনি রতিদেবীকে দেবেশবাবুর সঙ্গে আপত্তিকর অবস্থায় দেখেছেন। আমরা যতদূর জানি, এখানে একা আপনিই রতিদেবীর পূর্বজীবন সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন। তাই ব্ল্যাকমেইল করার সুযোগ আপনার ছিল। অর্থলোভ বড় সাঙ্ঘাতিক জিনিস। বিশেষ করে এই তরল জিনিসটায় যদি রুচি থাকে।" ইন্‌স্পেক্টার আর এক চুমুক হুইস্কি খেলেন।

নীলাঞ্জন বলে, "আমাকে তো কিছুদিন ধরে দেখছেন আপনি। সুযোগ না হয় আমার ছিল। কিন্তু ঠিক ব্ল্যাকমেইলারের চেহারার সঙ্গে আমাকে মেলাতে পারেন আপনি?"

পট্টনায়ক বিনা দ্বিধায় বলে, "না। আর সেটাই তো মুশকিল।"

নীলাঞ্জন এবার যেন একটু হালকা হয়। "মিঃ পট্টনায়ক, কোন বিশেষ অবস্থায় যে কোন মানুষ খুন করতে পারে, আমিও পারি। কিন্তু টাকার জন্য খুন করা, তা আবার হঠাৎ রাগের মাথায়, ওটা ঠিক আমার লাইনে পড়ে না। আমার খুনে থাকবে অনেকটা প্যাশন আর খানিকটা ফিলসফির পাণ্ড।"

"আপনি খামোখা রেগে যাচ্ছেন গুপ্ত সাহেব। আমি তো বলিনি আমি আপনাকে ব্ল্যাকমেইলার বা খুনী বলে সন্দেহ করছি? শুধু বলেছি হাতে যা প্রমাণ আছে তাতে আপনাকেই সন্দেহের তালিকায় প্রথম ফেলতে হয়। আমি শুধু পসিবিলিটিজ-এর কথা বলছি। জানেন কোন খুন বা ঐ জাতীয় সিরিয়াস ক্রাইম নিয়ে অনুসন্ধান চালাতে গেলে আমাদের একটা মস্ত অসুবিধায় পড়তে

হয়। অনেকেই নানা কারণে অনেক ছোটবড় সত্য কথা গোপন করে যায়। খুনের ব্যাপারে হাত থাকুক বা না থাকুক, তাদের ব্যক্তিগত জীবনের অনেক ছোটখাট ঘাটতি ঢেকে রাখার জন্য এই মিথ্যা ভাষণ। অনেকে আবার নার্ভাস হয়ে পড়ায় অনেক খুঁটিনাটি ব্যাপার বেমালুম ভুলে যায়। এসব খুঁটিনাটি ব্যাপার কিন্তু অনুসন্ধানের পথে অনেকটা অন্ধকার দূর করতে পারে। এই ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত গরমিল বা সত্যের অপভাষণ—এগুলো পরিষ্কার করে নেবার জন্য আমাদের ঘটনার সঙ্গে জড়িত সবাইকেই একটু বাজিয়ে দেখতে হয়। আপনার সঙ্গে তো আমার পার্টনারশিপই হয়ে গেছে একরকম। তাই আপনাকে দিয়েই শুরু করলাম।"

১২

আজ ঘনবর্ষা। ভোরের দিকে আকাশটা ছিল মেঘে ঢাকা। থমথম করছিল। সমুদ্রের তখন একটা বিচিত্র রূপ। দূরে জমাট কুয়াশায় প্রান্তসীমা হারিয়ে গেছে। সম্পূর্ণ শান্ত, একটা অন্তহীন মসৃণ গলা সীসের পাত যেন। কামানের গায়ের রং-এর মত জলের রং। হঠাৎ বৃষ্টি নামল। সীসের পাতটা হঠাৎ ফুঁসে উঠল। উত্তাল হল সমুদ্রবক্ষ। পাহাড়ের মত ঢেউগুলো গর্জে তেড়ে এল বেলাভূমির দিকে। তারপর বীয়ারের ছিপি হঠাৎ খুললে, বুদ্বুদভরা ফেনা ছলকে পড়ে যেমন কাদা কাদা হয়ে গড়িয়ে যায়, তেমনি সফেন তরঙ্গ ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে বালিতে মিশে যেতে লাগল। বৃষ্টির আর বিরাম নেই। বৈদ্যুতিক সংযোগ খানিকক্ষণ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আজ সমুদ্র তীরের পান্থশালায় আবাসিকেরা আবদ্ধ। তাদের চারদিকে গর্জাচ্ছে সন্দেহ আর ভয়ের কালো মেঘ।

নীলাঞ্জন একাই বসেছিল। সিংজী এসে তার পাশে বসলেন। সকাল থেকেই বোতল খুলে বসেছেন। তাতে ওঁর ভীতু ভীতু ভাবটা খানিকটা কমেছে। নীলাঞ্জনকে হুইস্কি অফার করলেন। নীলাঞ্জন বলল, এত সকালে তার চলে না।

সিংজী খানিকক্ষণ এদিক ওদিক তাকিয়ে নীলাঞ্জনকে জিজ্ঞেস করেন, "আচ্ছা পুলিশ ইন্‌স্পেক্টারের সঙ্গে তোমার তো খুব দোস্তি। কিছু ফয়সালা করতে পারল ওরা? আর কতদিন আমাদের এখানে আটকে রাখবে।"

নীলাঞ্জন হেসে ফেলে, "সেকি সিংজী, আপনার এত হিম্মৎ আর আপনিই কিনা এমন ঘাবড়ে গেলেন! বেশ তো আছেন, সমুদ্রের হাওয়া খাচ্ছেন। মুরগী মাটন চালাচ্ছেন। বোতল বোতল ব্ল্যাক নাইট ধ্বংস করছেন। ভয় কি আপনার? আপনি তো আর খুন করেন নি। নির্দোষ লোকের আবার ভয় কি?"

সিংজী বলেন, "খুনখারাবি অর্জুন সিং করে না বাবুজী। আওরৎ সে এনজয় করতে জানে। আওরৎ খুন করতে তার ইজ্জতে বাধে।"

নীলাঞ্জন মনে মনে সিংজীর কথার সঙ্গে সায় দেয়। দেবারতিকে ওড়নার ফাঁসে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেওয়া, এ জাতীয় ক্রাইম ওর চরিত্রের সঙ্গে খাপ খায় না। তার থেকে ওর পক্ষে ডাণ্ডা মেরে কাউকে সাবাড় করে দেওয়া বেশী বিশ্বাসযোগ্য। তবুও একটা জিনিস সহজেই চোখে পড়ে। পাঞ্জাব কেশরী বেশ একটু ভড়কে গেছে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রহস্যটা নীলাঞ্জনের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

সিংজী হঠাৎ গলা নামিয়ে নীলাঞ্জনকে বলেন, "দেখ, কয়েকদিন তোমাকে একটা কথা বলব ভাবছি। তুমি আমার ছেলের বয়সী। তারপর জার্নালিস্ট মানুষ।

তোমাকে আমি বিশ্বাস করে বলছি। ঐ পট্টনায়কটাকে আবার বলে দিও না কিন্তু।"

নীলাঞ্জনের হঠাৎ দেবারতির কথা মনে পড়ে। বলল, "দেখুন, খুনের সঙ্গে আপনার গোপনীয় কথাটার যদি কোন সম্পর্ক না থাকে তা হলে সে কথা আমি কারো কাছেই প্রকাশ করব না। এমন কি আমার স্ত্রীর কাছেও না।"

সিংজীঃ না না, খুনের সঙ্গে এ ব্যাপারের কোন যোগাযোগ নেই। বিশ্বাস কর ঐ দেবারতি মেয়েটাকে আমি চোখেই দেখেছি কয়েকবার। ওকে আমি একে-বারেই চিনতাম না। ব্যাপারটা আমার ব্যক্তিগত। চারদিকে পুলিশের চোখ। তাই আমি একটু সাবধান হতে চাই। কথায় বলে বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা।

নীলাঞ্জনঃ তা হলে বলেই ফেলুন।

সিংজীঃ ব্যাপারটা হল এই—আমি যখন সেই প্রথম দিন তোমায় বলেছিলাম আমার কোন ইনকাম নেই, একেবারে ষোল আনা সাচ কথা বলিনি। কিছু পয়সা না কামালে চলবে কি করে? সরাবের দাম দেবে কে?

নীলাঞ্জনঃ পয়সা কামানোতে ভয়টা কী? চুরি ডাকাতি করেন না তো।

সিংজীঃ না ঠিক চুরি নয়। আমার একটা ছোটখাট স্মাগলিং-এর কারবার আছে। আর আমি বিদেশে যাই ঘন ঘন। দু জামাই-এর কাছে। সেই ফাঁকে কিছু ফরেন এক্‌সচেঞ্জ লুকিয়ে দেশে নিয়ে আসি। এখানে ব্ল্যাকে চড়া দামে বেচি। মুশকিলটা হয়েছে কি এখন আমার ঘরে কুল্লে পাঁচ হাজার ডলার লুকোনো আছে। যে কোন সময় পুলিশ ঘর খানাতল্লাসি করতে পারে। কি করি বল তো!

নীলাঞ্জনঃ ঠিক আছে। আমি কাউকে এ কথা বলব না। কিন্তু আপনার কি সাহায্য করতে পারি আমি?

সিংজীঃ দেখ আমার একটা মতলব মাথায় এসেছে। তুমি জার্নালিস্ট লোক। তারপর পুলিশ ইন্‌পেক্টারের সঙ্গে তোমার দোস্তি। ঐ ডলারগুলো তোমার কাছে রাখবে? হাঙ্গামা সব চুকেবুকে গেলে তোমার সঙ্গে আমি একটা বখরা করে নেব না হয়।

নীলাঞ্জন হঠাৎ ভীষণ রেগে ওঠে। বলে "না না, এ সবের মধ্যে আমি নেই। কোন্ সাহসে আপনি আমাকে বখরার কথা বলছেন? তা ছাড়া আমার সঙ্গে আমার স্ত্রী আছে। আমি এ ঝক্কি নেব কেন? আর একটা কথা মনে রাখবেন। পুলিশ অফিসারের সঙ্গে আমার কোন দোস্তি নেই। এরকম কথা আর কখনও বলবেন না।"

গজ গজ করতে করতে উঠে যায় সে। এগিয়ে চলল নিজের ঘরের দিকে। হঠাৎ কোণের একটা ঘর থেকে ভেসে আসে কিছু কথার টুকরো। রহস্যময় সংলাপ। নীলাঞ্জন কিছুক্ষণের জন্য বিলিতি শিক্ষা শিকেয় তুলে কান খাড়া করে শোনে। নারীপুরুষের কণ্ঠস্বর।

পুঃ আমি কি করব বল। আমি কি আর জানতাম এ রকম একটা ফ্যাসাদে পড়ব?

নাঃ তখনই বলেছিলাম, এসব করলে ভাল হয় না। কেন তুমি আমাকে এখানে নিয়ে এলে?

পুঃ কেন? আসার সময় তো তুমিই খুব গরজ দেখিয়েছিলে। এখন চাপে

পড়ে সব দোষ আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছ। মেয়েদের সবারই এক স্বভাব।

নাঃ মেয়েদের ব্যাপারে তুমি যে একজন মস্ত এক্সপার্ট তা আমার জানা আছে। এখন সব জানাজানি হলে কেলেঙ্কারীর আর শেষ থাকবে না। দুদিনের জন্য আসা, আজ পাঁচ'ছদিন হয়ে গেল। কবে ছাড়া পাব ঠিক নেই। রমেশকে যে কি লিখি? ও জানি কি ভাবছে। অল্পেতেই এত নার্ভাস হয়ে পড়ে।

পুঃ আজ হঠাৎ রমেশ রমেশ করছ কেন? লজ্জা করে না ন্যাকামি করতে? এই সেদিনও আমার বুকে শুয়ে 'তোমাকে ছাড়া আমি একটা দিনও থাকতে পারব না' বলে আমায় চুমু খাচ্ছিলে। আজ রমেশ রমেশ কেন? লিখে দাও তোমার স্বামীকে, প্রাণনাথ, সুকান্তর সঙ্গে রাত কাটাতে এসে একটা খুনের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি। তুমি আমাকে বাঁচাও। দেখি ঘোষাল সাহেব কি করেন?

নাঃ তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার ঘেন্না হয়।

নীলাঞ্জন সরে যায়। সেই একঘেয়ে রতিলীলা।

১৩

আবার সকালবেলা। পট্টনায়ক সাহেব তাঁর কামরায় বসে অভ্যেসমত নীলা-ঞ্জনকে তলব করলেন। নীলাঞ্জন গিয়ে দেখে গোপাল বসে আছে আড়ষ্টভাবে ইন্‌স্পেক্টরের মুখোমুখি। চেহারা দেখে মনে হয় যেন বহুদিনের অসুখ থেকে সবেমাত্র সেরে উঠেছে। শরীরটার বাঁধন কেমন আলগা হয়ে গেছে কদিনে। পট্ট-নায়ক সাহেব খুব খিস্তি করছেন ওকে আর ও চুপচাপ শুনে যাচ্ছে। নীলাঞ্জন আসার পর পট্টনায়ক একটু ঠাণ্ডা হলেন। গোপালকে বল্লেন, "আমি জানি খুনের রাত্রে তুমি এখানে এসেছিলে। শুনতে পেলাম তুমি এখানে দুটো মেমের পেছনে ঘুরঘুর করতে। তোমার কি উদ্দেশ্য ছিল জানি না। জিনিস টিনিস মেরে দেবার তালে ছিলে হয় তো। যাক তা নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। কিন্তু আমি জানি ঐ মেয়ে দুটো চলে গেছে দেখে তুমি এখান থেকে বেরিয়ে সমুদ্রতীরের দিকে যাও। মদও খেয়েছিলে তুমি, আর আমি এও জানতে পেরেছি যে তুমি সে রাতে মোটেই বাড়ী ফেরনি। কোথায় ছিলে সারারাত? কী করছিলে? বল, না হলে কপালে তোমার দুর্ভোগ আছে।"

গোপাল শুকনো মুখে চুপচাপ বসে থাকে। বলে, "আমি কোথায় গিয়ে-ছিলাম কি করেছি আমার কিছুই মনে নেই।"

"চোপ রও।" পট্টনায়ক হুঙ্কার ছাড়লেন। 'তুমি বলতে চাও তুমি সেই অমাবস্যা রাতের ঘুটঘুটে অন্ধকারে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়িয়েছ আর কোথায় গেছ এখন কিছুই মনে করতে পারছ না? আর পরদিন ভোরে কিনা তুমিই খুঁজে পেলে দেবারতিদেবীর মৃতদেহ? তোমার এই গল্প কেউ বিশ্বাস করবে? আমাকে তুমি বোকা পেয়েছ?

গোপাল তবুও চুপ করে বসে থাকে। কোন জবাব দেবার তার ইচ্ছে আছে বলে মনে হয় না।

এমন সময় ঝড়ের মত ঘরে ঢুকল লছমি। এসেই ইন্সপেক্টরকে বলল, "কেন তুমি গোপালকে এরকম করে জোর জবরদস্তি করছ? ওকে জেরা করার কি আছে? ও তো কিছু করেনি। সেদিন সারারাত ও আমার সঙ্গে ছিল। ভগবানের নামে শপথ করে একথা বলতে পারি।"

গোপাল অবাক হয়ে লছমির দিকে তাকিয়ে থাকে। ওর মুখ হঠাৎ ঝলমল করে উঠল।

পট্টনায়ক বল্লেন, "ও, এই ব্যাপার। জেলের ছেলের আবার শিভালরি। যাও, এক্ষুনি পালাও এখান থেকে।"

তারপর গুম হয়ে বসে থাকেন। নীলাঞ্জন হাসিমুখে তাকিয়ে থাকে ওর

দিকে। বলে, "কি হল?"

পট্টনায়ককে খুবই মনমরা লাগে। "কোনদিকেও সামান্য একটু আলোর হদিশ পাচ্ছি না গুপ্ত সাহেব। ভাবলাম গোপালটাকে একটু চাপ দিলে কিছু খবর পাওয়া যাবে। সে গুড়ে বালি। শালা প্রেম করছে। মুস্কিল হচ্ছে কি জানেন, এখানে অনেকেই কিছু না কিছু গোপন করার জন্য ব্যস্ত। মন খুলে কথা বলতে কেউই চাইছে না। এই ধরুন আপনাদের সিংজী। পালিয়ে পালিয়ে বেড়ান। সঙ্গে কয়েক হাজার বেআইনী ডলার আছে—না চমকাবেন না, ও খবর আমি কয়েকদিন আগেই পেয়েছি—সে তা লুকোতেই ব্যস্ত। এদিকে আর্টিস্ট সুকান্ত দত্ত এসেছিলেন আই এ এস অফিসার রমেশ ঘোষালের সুন্দরী বউ-এর সঙ্গে দিন দুই পরকীয়া প্রেম চালাতে। আটকা পড়ে এখন দুজনে পরস্পরের পিণ্ডি চটকাচ্ছেন। এ'রা সবাই ভাবেন পুলিশের কাছে তাঁদের গোপন খবর অজানা। আসলে আমি ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে এখন মাথা ঘামাতে রাজী নই। আমার এখন একটাই চিন্তা। দেবারতিদেবীর মৃত্যুরহস্যের কিনারা করা। আর বেশীদিন আপনাদের এই পান্থশালায় আটকে রাখা উচিত হবে না।"

নীলাঞ্জনঃ হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলুন দেখি।

১৪

সেদিন সকাল থেকেই নীলাঞ্জনের ইচ্ছে ছিল বিমলের সঙ্গে বসে একটু আলাপ করবে। কিন্তু ঠিক সুযোগ হচ্ছিল না। রতির মৃত্যুর পর কয়েকদিন সকালে ওকে একা থাকতে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। এ ধরনের আকস্মিক আঘাতের শোক সহ্য করতে বেশ কিছুদিন লাগে। আর অন্য কারুর মৌখিক সহানুভূতিতে সে শোক কিছু কমে না। নীলাঞ্জন ভাবে, এ কদিনে বিমলবাবু বোধহয় খানিকটা সামলে নিয়েছেন। এখনও সবাই যদি ওকে এড়িয়ে চলে তবে উনি হয় তো মনে করবেন সবাই তাকে নিজেদের দুর্দশার জন্য দায়ী করছে। বিকেলের দিকে বিমলকে একা পাওয়া গেল একটা সুবিধে মত জায়গায়। নীলাঞ্জন তার পাশের চেয়ারটায় গিয়ে বসল।

"কি বিমলবাবু, কেমন আছেন?"

"আমার আর থাকা। কি যে হয়ে গেল সব এখনও ঠিক মগজে ঢোকেনি আমার। এক বুঝি রতি চলে গেছে। আর আসবে না।"

"ও সব কথা ভেবে আর কি হবে?"

"নীলাঞ্জনবাবু, আপনি অন্তত আমাকে ও ধরনের মামুলি সান্ত্বনার কথা বলবেন না।"

নীলাঞ্জন খানিকক্ষণ নিজের মনের গভীরে তলিয়ে যায়। মনে পড়ে সীতার সেই ফুলের মত মুখ—এক দিকটা পুড়ে কাল হয়ে গেছে। কানে কানে শুনতে পায় তার চিঠির শেষ কথাকটি। "তোমাকে আমি মুক্তি দিলাম।" সীতা জানত না এ মুক্তি কত কঠিন বন্ধন হতে পারে। বিমলও মুক্তি পাবে না। রতি চলে গেছে এ ঘটনা ভোলার নয়। পরবর্তী জীবনে হয় তো অন্য অনেক মেয়ে আসবে। অন্য অনেক ঘটনা ঘটবে। কিন্তু কালের স্রোতে এ ঘটনা ধুয়ে-মুছে যাবে না। সীতা নিজেকে নিজেই এ জগৎ থেকে সরিয়ে দিয়েছিল, রতিকে সরিয়েছে অন্য কারুর হাত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দাঁড়ায় গিয়ে সেই একই।

আস্তে আস্তে বিমলকে বলল নীলাঞ্জন, "না, এরকম কথা আর বলব না। আমি জানি, আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানি এ রকম কথার কোন মানে হয় না। জীবনে একটা দুটো দুর্ঘটনা ঘটে যা মৃত্যু পর্যন্ত দাগ রেখে যায়। আপনার জীবনেও সে রকম একটা দুর্ঘটনাই ঘটেছে। কিন্তু জানেন, শীগ্গিরই আপনি সাধারণ অন্য সকলের মতই হাসবেন, কাঁদবেন, ছোটখাটো সুখ দুঃখ নিয়ে জীবনের সময়ের স্রোতে মিশে যাবেন। এমনিই হয়।"

বিমল ফস করে বলে ফেলে, "রতির এই আকস্মিক মৃত্যুতে কিন্তু আমার বড় একটা লাভ হয়েছে।"

নীলাঞ্জন অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে।

বিমলের মুখে একটা বাঁকা হাসি খেলে যায়। সে বলে চলে। "জানেন রতির মৃত্যুর আগে অনেক সময়ই মনে হয়েছে ওকে আমার এই দু'হাত দিয়ে গলা টিপে মেরে ফেলি। আমি জানি আজ পুলিশের সাস্পেক্টদের তালিকায় ওপরের দিকে আমার নাম। আমি কিন্তু ওকে খুন করিনি নীলাঞ্জনবাবু।"

নীলাঞ্জনের মুখ দিয়ে কথা সরে না।

বিমলের মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে কথার স্রোত। "জোলার উপন্যাসের সেই নায়কের সঙ্গে আমার কিন্তু মিল নেই। ভালবাসার পাত্রীকে সঙ্গমের শেষে নিজের হাতে মেরে ফেলার কোন অদম্য বাসনা আমার হয় না। রতিকে ধ্বংস করে ফেলতে ইচ্ছে হত সম্পূর্ণ স্বাভাবিক কারণে। বিয়ের দু এক দিনের মধ্যেই আমি রতির আসল চেহারাটা টের পেয়েছিলাম। ওর চরিত্রে ভারসাম্যের ভীষণ একটা অভাব ছিল। তাছাড়া একটু মানসিক রোগগ্রস্ত ছিল সে। একই পুরুষের সঙ্গে বারবার দেহমিলনেও ওর আকাঙ্ক্ষা মিটত না। প্রবৃত্তির তাড়নায় সে খুঁজত বহু পুরুষের সঙ্গ। এসব মেয়েরা বোঝে না যে স্বাধিকার-প্রমত্তা হতে গিয়ে তারা অজান্তেই নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনে।"

"আমি জানি এ কদিনে ইনস্পেক্টার পট্টনায়কের সঙ্গে আপনার অনেক খোলাখুলি কথাবার্তা হয়েছে। আমি আরও জানি পট্টনায়ক এরই মধ্যে রতির প্রাক্‌বিবাহ জীবনের অনেক অসামাজিক কার্যকলাপের কথা মাটি খুঁড়ে বের করেছেন। কিন্তু এ সব আমার কাছে নতুন খবর ছিল না। রতির মনের অসুখের খবর পাই আমি আস্তে আস্তে, ঘন্টার পর ঘন্টা দিনের পর দিন ওর সঙ্গে কাটিয়ে। রতি বোধহয় মনে করত আমি একেবারে গোবরগণেশ মানুষ, কিছুই বুঝি না। সে গোপনে একটা ডায়েরী রাখত। ওর মৃত্যুর পর তার কয়েকটা পাতা আমার হাতে এসে পড়ে। পড়ে আমি যতটা দুঃখ পেয়েছি, রতির সম্বন্ধে আমার করুণা হয়েছে তার চেয়ে বেশী। কিছুই আশ্চর্যের নয়। বেচারী বেঘোরে প্রাণ হারাল।

ফুলশয্যার রাতেই আমি দুটো জিনিস আবিষ্কার করি। এক, রতির দেহের সৌষ্ঠব কোনার্কের ভাস্কর্যের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে। তাতে আমার আহ্লাদ হয়েছিল বই কী। কিন্তু সেই দেহের দখল নিতে গিয়ে আমার মনে হয়েছিল ওখানে আমার আগেও কেউ কেউ তাঁবু গেড়েছে। আর সে সন্দেহ আরও গভীর হল সেই রাতে তার অভাবনীয় দক্ষতা দেখে। সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হল দিন দুই যেতে না যেতেই। আমাদের উত্তেজনা যখন পাহাড় চূড়ায় পৌঁছোত, তখন রতি কেমন পাগলের মত আমার নাম ধরে ডাকত। একদিন রাতে আমরা দুজনেই শখ করে বেশ একটু নেশা করে শুতে যাই। সেদিন রতির উত্তেজনা যেন একেবারে বাঁধ ভেঙে গেছল। চূড়ান্ত উত্তেজনায় হঠাৎ সে নাম ধরে ডাকতে লাগল, কিন্তু এবার সে নাম ছিল কোন এক অজানা পুরুষের নাম। আমি যেন স্রোতের প্রতিকূলে সাঁতরাতে গিয়ে একটা বিশাল ঢেউ-এর ধাক্কা খেলাম। ওকে কিছুই বলি নি। তবে খুব কড়া চোখে নজর রাখলাম। ভাসাভাসা খবরও কিছু কানে এল এখান সেখান থেকে। শুভাকাঙ্ক্ষীর তো আর অভাব নেই। প্রথম প্রথম আমার শরীর ঘৃণায় রি রি করত। প্রায়ই ভাবতাম ঐ প্রতারক মেয়েটিকে জগৎ থেকে সরিয়ে ফেললে কেমন হয়। এই সমুদ্রতীরে এলাম একদিন। আমার

পেছনে যে আমার ঐ অবদমিত জিঘাংসা একেবারে কাজ করেনি তা নয়। এই তো একটা সুযোগ। কেউ কিছু জানবে না। কিন্তু ঐ ইচ্ছা কাজে পরিণত করার ক্ষমতা আমার ছিল না। শেষ পর্যন্ত আমাকে কিছু করতে হল না। আর একজন কে সে কাজ করল অতর্কিতে। কেন আজও জানিনা। কিন্তু এই নৃশংস হত্যায় আমার মনের গতি একদম পাল্টে গেল।"

নীলাঞ্জন ভাবলেশহীন মুখে তাকিয়ে থাকে বিমলের দিকে। কোনার্কের সেই নির্বাক শ্রোতা বিমল আর আজকের বিমলে কত তফাৎ।

বিমল বলে যায় নিজের খেয়ালে। "রতির প্রতি রাগে আর ঘৃণায় যখন আমার বুক জ্বলে যাচ্ছে তখনও কিন্তু আমি তার দেহকে অস্বীকার করতে পারিনি। বিছানায় তার দেহ বুকে চেপে ধরে আমি উল্লাস আর উত্তেজনার ভূমিকম্পে দুলেছি। কিন্তু সব শেষে আমার চেতনায় এসে লাগত উচ্ছিষ্ট গ্রহণের গ্লানি—পুরোনো সংস্কার একটা। সাব্লিমেশন খুঁজে নিলাম—আমার ক্যামেরায় দেবারতির দেহারতি করে।

আজ আমি অসম্ভব ক্লান্ত। আজ আর রতির প্রতি আসক্তিতে আমি লজ্জার কিছু দেখি না। এখন বোধহয় তার সব দোষ জেনে শুনে অসংকোচ আনন্দে আমি তাকে গ্রহণ করতে পারি। শুধু ও আজ নেই। রতিকে আমি আজ সর্বান্তকরণে ক্ষমা করতে পারতাম। তাই ক্ষমা করতে পারি না সেই হত্যাকারীকে যে নিষ্ঠুর হাতে তাকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে দিয়েছে। রক্তমাংসের রতিকে ক্ষমা করার সুযোগ সে আমাকে দিল না। আমার চোখে হত্যার চেয়েও তা বড় অপরাধ।"

১৫

প্রথম জীবনে বাবাকে ভালবাসতাম। তারপর কলেজের এক ছোকরা লেকচারার-এর প্রেমে পড়েছিলাম। মাথায় ভদ্রলোকের একরাশ তেল চকচকে কোঁকড়ানো চুল ছিল, আর কথায় শান্তিনিকেতনী ঢঙ। কিন্তু শেষকালে ভাল লাগল নীলাঞ্জন গুপ্তকে। সকলেই খুব অবাক হয়ে গিয়েছিল। শ্যামলী চক্রবর্তীর এ কী খেয়াল হল?

অবাক হবার যথেষ্ট কারণ ছিল। নীলাঞ্জনকে যখন আমি প্রথম দেখি তখন সে একটা ভগ্নস্তূপ। ভগ্নস্তূপের একটা গম্ভীর বিশিষ্টতা থাকতে পারে, কিন্তু জীবন কাটানোর জন্য তার সাহচর্য নেহাৎই অবাঞ্ছনীয়। সেই ভগ্নস্তূপের সামিল একজন উত্তরযৌবন পুরুষ মানুষকেই আমি জীবনসঙ্গী হিসেবে বেছে নিলাম। একবার বেছে নেবার পর সব বাধা উপেক্ষা করার জেদ আমার দিনে দিনে বেড়ে যেতে লাগল। বাবা মা ভাই বোন সবার অনুরোধ উপেক্ষা করে শুভদৃষ্টির জন্য তৈরী হলাম। একদিন শাঁখ বাজল।

বহুদিন মনে ছিল আশা, খুব ঘটা করে আমার বিয়ে হবে। শানাই বাজবে। আলো জ্বলবে। শাড়ী গয়নায় বিয়ের আসর ঝকমক করবে। বিয়েটা আমার হিন্দু মতেই হল। আলোও জ্বলল। কিন্তু শানাই বাজল না। জাঁকজমকও একটু কমের দিকে। দুপক্ষেরই কেমন দায়সারা ভাব।

বাসর-ঘরে পোঁছে নীলাঞ্জন আমার দিকে তাকিয়ে ছোট্ট একটু হাসল। এই হাসিই এতদিন আমার দুঃসাহস জুগিয়েছে।

আমি কাছে এগিয়ে গেলাম। নীলাঞ্জনের মুখে মদের গন্ধ।

হঠাৎ রাগে আমার সারা শরীর কাঁপতে লাগল। তীক্ষ্ন গলায় বললাম, "আজকের দিনেও একটু সামলে চলতে পারলে না?"

নীলাঞ্জন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ। "কেন, কী করেছি আমি?" সে জিজ্ঞেস করল।

"কী করেছ জান না? আজও গিলে এসেছ?"

"কিন্তু তোমরা তো সবাই জানো আমি মদ খাই। আজকে এই আনন্দের অনুষ্ঠানে নিজেকে অতৃপ্ত রাখব কেন? তাছাড়া একটু মদ না খেলে আমার শরীর অস্থির করে।"

"না, একটু মদ খাওয়াও তোমার চলবে না। মদ খেলে তুমি আমার কাছে আসতে পারবে না।"

"তুমি খুব ভুল করছ শ্যামলী। জোর করে, গালিগালাজ করে, তুমি আমায় মদ ছাড়াতে পারবে না। আর মদ ছাড়ার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে

করি না। তবে একটা বড় দায়িত্ব কাঁধে নিলে সে দায়িত্ব নীলাঞ্জন গুপ্ত পালন করে মনপ্রাণ দিয়ে। তোমাকে আমার মদ খাওয়ার জন্য পথে বসতে হবে না।"

তারপর একটার পর একটা সিগারেট খেতে খেতে সে বলল তার জীবনের করুণ কাহিনী। আমি এক মনে শুনলাম। মুখে ওর প্রতি সমবেদনা জানালাম! ওর স্পষ্টবাদিতার প্রশংসা করলাম। কিন্তু মনে মনে বললাম, আমাকে এই বাসর রাতে এসব কথা না বললেই ভাল করতে নীলাঞ্জন। এরপর দিনের পর দিন আমি হয়তো তোমাকে শ্রদ্ধা করব, তোমাকে বোঝার চেষ্টা করব। কিন্তু তুমি তো আর কোনদিন আমার আপনজন হবে না।

তারপর থেকেই শুরু স্বাভাবিকতার সঙ্গে আমার নিত্যসংগ্রাম। আঘাতও এসেছে অনেক। শুধু দেখেছি একটা মানুষের অসাধারণ ধৈর্য, সহনশক্তি আর আত্মসংযম।

বিয়ের অল্প কদিনের মধ্যেই নীলাঞ্জন আমার থেকে বয়সে অনেক এগিয়ে গেল। মদ খাওয়া ওর নিজের থেকেই কমল। ওর সংযম যতই বাড়ল আমার আঘাতও ততই তীক্ষ্নতর হতে লাগল। নীলাঞ্জন কিন্তু নীলকণ্ঠ।

মাঝে মাঝে আমি বিরক্ত হতাম ওর ঐ নিরাসক্ত নির্বিরোধিতায়। বলতাম, "যাও না, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে এসো। মাঝে মাঝে একটু বেচাল হলে কিছু যায় আসে না। সব সময় তোমার ঐ পানশে চেহারা দেখে আমারও মুখ ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছে আসে।"

নীলাঞ্জন নির্বিকার। বলে, "বেচাল যেদিন হব শ্যামলী, সেদিন চালচুলো আর অবশিষ্ট থাকবে না। সে সময় এখনও আসেনি। তোমার মুখের স্বাদ পালটাবার জন্য আমি আমার চরিত্র পালটাব না কোনদিন।"

এমনিতে কিন্তু নীলাঞ্জন উদাসীন নয়। সংসারের খুঁটিনাটি প্রয়োজনে ওব চোখ থাকে। খুব একটা কাজের লোক ও নয় কিন্তু চোখ দুটো ওর সদাজাগ্রত।

আর দেহের উত্তাপেও বিন্দুমাত্র বিমুখ নয়। একটি মেয়ের শরীরে খুশীর হুল ফোটানোর বিদ্যে ওর করায়ত্ত।

কিন্তু তবুও যেন কি একটা বিরাট ফাঁক থেকে যায় সব কিছুতেই। সব সেবা, সব যত্ন, সব উত্তাপ কেমন যেন একটা লেবরেটারিতে তৈরি ফর্মুলামাফিক মনে হয়। সবই সে করে, কিন্তু সে যেন সব কিছু থেকে আলগা হয়ে থাকে। আমি ওর খুঁত ধরার চেষ্টা করি প্রতি মুহূর্তে। না পেরে নিষ্ফল আক্রোশে ফুঁসি। ও কিছু বলে না। আমার রাগ আরও যেন বেড়ে যায়। সবচেয়ে রাগ হয় যখন ও ক্ষণিকের জন্যও কোন গাফিলতি করলে পরে সবিস্তারে নিজের অপরাধের ফিরিস্তি নিজেই দিতে বসে।

মাঝে মাঝে ও যেন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। মনে হয় যেন কান পেতে কিছু শুনছে। আমি তখন ওর কাছে থেকেও নেই।

ওর ঠাট্টাতামাশাও কেমন যেন অন্য ধরনের। কথার ওপর কথা বসিয়ে ও খুব আমোদ পায়। বলে, 'আমি যে কথার ব্যবসা করি।' মন যখন ওর খুব খুশী থাকে, ওর র‍্যাশন করা মদ্যপানান্তে, তখন ও আমাকে ডাকে শ্যামলছায়া বলে। বলে, 'শ্যামলী, তুমি আমার জীবনের রুক্ষ মরুভূমিতে শ্যামলছায়া।' আমি নিজের মনে বলি, 'কায়া কখনও চিরকাল ছায়া থেকে আনন্দ পায় না।'

আমার দিক থেকে যে ফাঁকিটা আছে সেটা কিন্তু আমি বেমালুম ভুলে

খাই। তা ছাড়া আমার মনের বিষ বিয়ের পর একটা নতুন পথ নিয়েছে। হিংসার পথ। নীলাঞ্জনের যাদের প্রতি দুর্বলতা তাদের আঘাত করে আমি বদলা নিই। তাদের বিরুদ্ধে নীলাঞ্জনকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করি। সে শুধু হেসে বলে, 'বছরের পর বছর কয়েক হাজার ট্র্যাংকুইলাইজার খেয়ে আমি অনির্বাণ শান্তি লাভ করেছি। উত্তেজনা আমাকে স্পর্শ করতে পারে না।'

খানিকটা বোধহয় সত্যি কথাই বলে ও। নিস্পৃহতাকে যেন ও জীবনমন্ত্র করে নিয়েছে। বিয়ের পরই একটা ছোট ঘটনায় আমি টের পেয়েছিলাম। আমার এক বান্ধবী নমিতা প্রায়ই আমাদের বাড়ী যাতায়াত শুরু করেছিল। প্রথমে প্রথমে আমি ভাবতাম একটা ভগ্নস্তূপের সঙ্গে সংসার করতে আমার কেমন লাগছে সেটা জানার জন্যই ওর কৌতূহল। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই আসল ব্যাপারটা আমার চোখে ধরা পড়ে গেল। মেয়েরা মেয়েদের চোখের ভাষা বুঝতে কখনও ভুল করে না। শান্ত-সমাহিত নীলাঞ্জনের দিকে যখন তাকিয়ে থাকত তার মনের কথা চোখে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠত। এক নীলাঞ্জনই তা দেখতে পেত না। আমি একদিন গায়ে পড়ে নমিতার সঙ্গে ঝগড়া করলাম সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে। নমিতা তারপর আর আসেনি। কিন্তু আমার হাতে দিয়ে গেছে নীলাঞ্জনকে আঘাত করার জন্য ধারাল একটা অস্ত্র।

একদিন নীলাঞ্জনই হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা শ্যামলী, নমিতা আর আসে না কেন? ঝগড়া হয়েছে নাকি তোমাদের?"

আমি খেঁকিয়ে উঠলাম, "আমাদের ঝগড়া হতে যাবে কোন্ দুঃখে? যা করার তা তো তুমিই করেছ। এখন সাধু সাজার চেষ্টা করছ, ওতে কোন লাভ হবে না। তোমাকে হাড়ে হাড়ে চিনি।"

ও কেমন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ। তারপর ব্যাপারটা বুঝে হা হা করে হেসে উঠল। বলল, "ও, এই ব্যাপার। নীলাঞ্জন গুপ্ত তা হলে মেয়েদের চোখে আবার পুরুষ মানুষের সার্টিফিকেট পেল! তা আমি কি করে-ছিলাম যে তোমার বন্ধুর এত রাগ?"

আমি মুখ বেঁকিয়ে বললাম, "কি করেছিলে তা তুমিই জান। নমিতা কখনও মিথ্যে কথা বলে না।"

দিনের পর দিন একই ব্যাপারের জের তুলে আমি বিষ ঢেলেছি। নীলাঞ্জন শুধু হা হা করে হেসেছে।

কিন্তু আমার মনে একটা কাঁটা ফুটে গেছে। আজ নীলাঞ্জনকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চায় এমন মেয়েও আছে। খুব সতর্ক থাকতে হবে, নীলাঞ্জনকে হারানো মানে আমার শোচনীয় পরাজয়।

আমাদের সহবাস বা সহাবস্থান মাঝে মাঝে ফাটলের খুব কাছাকাছি পেঁছে যায়। নীলাঞ্জন অমনি কোথাও যাওয়ার টিকেট কেটে বসে। এমনিতে একটু চাপা আর গম্ভীর স্বভাবের হলেও এই বেড়াতে বের হওয়া নিয়ে ও শিশুর মত হাস্যোচ্ছল হয়ে ওঠে। খোলা হাতে খরচ করে। বছরের সব সঞ্চয় অল্প ক'টা-দিনের ভেতর হাওয়ায় মিশিয়ে যায়। কিন্তু তাতে সে দৃকপাত করে না। বলে, 'ছুটিতে বেরোলে আমরা সবাই রাজা।'

এবার এলাম এই সমুদ্র শহরে। কেন জানি এবার আসার সময় আমার মনে কিসের একটা বাধা বোধ করেছি। ক'দিন ধরে নীলাঞ্জন যেন একটু বেশী রকমের

আনমনা। মাতলামি না করলেও মদ নিয়ে কিছুদিন ও একটু বেশী সময় কাটায়। আত্মীয় বন্ধুবান্ধব সবাই বলে, সাবধান শ্যামলী। একটা বাচ্চাটাচ্চা সংসারে আনার ব্যবস্থা কর। নইলে নীলাঞ্জন হয়তো আবার জলপথে গড়িয়ে যাবে। আমি হেসেছি। সংসারে সন্ন্যাসী ঐ মানুষটিকে ওরা একেবারেই চেনে না, ওর বাঁধন যতই শক্ত হবে বাঁধন ততই খুলবে।

কিন্তু সমুদ্র শহরে এই পান্থশালায় আসার পর থেকে আমার ভাগ্যাকাশে যেন একটা কালো মেঘ হঠাৎ থাবা বাড়িয়ে এগিয়ে এসেছে। আমার সঙ্গে প্রথম শত্রুতা করল অদূরের ঐ অনন্ত বারিধি। আমি নীলাঞ্জনকে বিভিন্ন জায়গায় পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে বিভিন্নভাবে আত্মলীন হতে দেখেছি। বরফের দেশে গেলে ওর মনটাও যেন কেমন স্বচ্ছ সাদা হয়ে যায়। শান্তিনিকেতনের ফুল-ছড়ান আঙিনায় ওকে খুব স্নিগ্ধ লাগে। কিন্তু সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের কলোচ্ছ্বাসে কিংবা নিস্তরঙ্গ বৈরাগ্যে ওকে অস্বাভাবিক রকমের উত্তেজিত দেখায়। হঠাৎ যেন ওর চরিত্রের একটা অজানা দিক আলোয় এসে দাঁড়িয়েছে। সে দিকটা আমাকে অস্বস্তি দেয়। কেমন যেন ধ্বংসের একটা ছবি চোখে ভেসে ওঠে। জানি না কেন।

তারপর এলেন সিংজী। এমনিতে লোকটিকে খুব দিলদরিয়া মাই ডিয়ার টাইপের মনে হয়। নীলাঞ্জনকে তাতানোর জন্য ওর সামনে আমি কখনও কখনও অনেক অল্পবয়সী ছেলের সঙ্গে অকারণ আদিখ্যেতা দেখিয়েছি। সিংজীর বেলায় অবশ্য সে সব কথা ওঠে না। আমার বাবার থেকেও ওঁর বয়স বেশী। তবুও ওঁর সঙ্গে গল্প করতে আমার ভাল লাগে, সত্যি কথা বলতে কি, নীলাঞ্জনকে বিয়ে করার পর গল্প করার সুযোগ আমার বেশী হয়নি। প্রথম প্রথম যখন ওর একান্নবর্তী পরিবারে থাকতাম তখন শ্বাশুড়ী, জা, ননদরা সবাই আমাকে একটা অদ্ভুত কৌতূহলের চোখে দেখতেন। কারণ, তারা সবাই বাড়ীর ঐ ছেলেটিকে খরচের খাতায় ঠেলে দিয়েছিলেন। ওঁদের কারও সঙ্গে প্রাণ খুলে গল্প করা যেত না। আর স্বামীটি তো একটি দার্শনিক। ওর সঙ্গে সামান্য খুনসুটিও আলোচনার পর্যায়ে চলে যায়।

কিন্তু আমি বেশ টের পেয়েছিলাম নীলাঞ্জনের বর্তমান মানসিক অবস্থায় সিংজীর সঙ্গ মোটেও অনুকূল নয়। সিংজীর মধ্যেও যেন একটা গোপন ধ্বংসের নেশা আছে। ওর সঙ্গে বসে যে নীলাঞ্জন রোজ ওর র‍্যাশনের অতিরিক্ত দু এক পাত্র বেশী মদ খাচ্ছিল তাই না, সিংজীর উত্থান পতনের কাহিনীতে ও স্বভাব-বিরুদ্ধ কৌতূহল দেখাতে শুরু করেছিল।

এসব খুবই তুচ্ছ হয়ে গেল একদিন সকালবেলা। দেবারতি বলে মেয়েটি হঠাৎ খুন হল। দেবারতিকে দেখার পর নীলাঞ্জনের ভেতরে ভেতরে কেমন একটা চাপা অস্থিরতা আমি লক্ষ্য করি। সাধারণ একটি সুন্দরী মেয়ে দেখে পুরুষের যে চিত্তচাঞ্চল্য হয় এ তা নয়। কিন্তু নীলাঞ্জন নিজের থেকে না বললে তার মন থেকে গোপন কথা বের করা দক্ষ ডুবুরীরও অসাধ্য। দেবারতির মৃত্যুর পর ও অবশ্য আমাকে বলেছে যে ও মেয়েটিকে তার বিয়ের আগে একবার দেখেছিল। দেবারতির সঙ্গে নীলাঞ্জনের কোনদিন দেহ বা মনের কোন ঘনিষ্ঠতা হয়নি, হলে ও ঠিকই আমাকে বলত। কিন্তু রহস্য একটা আছে আমার সন্দেহ নেই।

দেবারতি খুন হবার পরও নিস্তার নেই। এলেন ইনস্পেক্টার পট্টনায়ক।

কেন জানি বেছে বেছে নীলাঞ্জনের সঙ্গেই ওর যত খুন নিয়ে কচকচি। নীলাঞ্জনও দেখি আদানুন খেয়ে অনুসন্ধানে নেমেছে। সব সময় ঐ নিয়েই ভাবে। এমনিতে মুখচোরা মানুষ, দেখি যেচে পান্থশালার অন্য গেসটদের সঙ্গে খুন নিয়ে কথা-বার্তা বলছে। সব সময় কৌতূহলী চোখে ও সকলকে যেন যাচাই করে দেখছে। সখের গোয়েন্দাগিরির নেশায় ছেলেমানুষী করার পাত্র নীলাঞ্জন গুপ্ত নয়। কিন্তু কেন তবে এই অস্বাভাবিকরকম জড়িয়ে পড়া।

কাল রাতে একটা দৃশ্য দেখে আমি ভয়ে বোবা হয়ে গিয়েছি। ঘুটঘুটে অন্ধকারে নীলাঞ্জন সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে আছে, হাত দুটো মুঠো পাকান। কপালের রগগুলো ফেটে পড়ছে যেন। ভূতে পাওয়া মানুষের মত ও বিড়বিড় করছে। আমি কাছে এসে দাঁড়িয়েছি ওর হুঁশ নেই। আমি ওর জড়ান কথা বুঝতে পারছিলাম না। শুধু একটা নাম কানে এল, সুধাময়। অবাক হবার কথা। এত বছর তো কোনদিনও ওর কাছে ঐ নামটা শুনিনি। কে এই সুধাময়?

একদিন নীলাঞ্জন হঠাৎ আমার সঙ্গে আড্ডা দিতে বসল। খুবই অবাক হয়েছিলাম। অনেকদিন হল, বিশেষ করে পান্থশালায় আসার পর সে কখনও একলা বসে আমার সঙ্গে গল্প করেনি। সত্যি কথা বলতে কি সন্ধ্যের পর মদের গেলাস নিয়ে বসার পরই তার মুখ খোলে আজকাল। অন্য সময় সে শুধু কাজের কথাটুকুই বলে। এত নীচু গলায় বলে, সব কথা শোনাও যায় না।

কিছুক্ষণ গল্প করার পর দেবারতির মৃত্যুর কথা উঠল। আমি হঠাৎ একটু দুঃসাহসী হয়ে উঠলাম। জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা, সুধাময় কে?"

নীলাঞ্জন খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। তার দু চোখে গভীর বিস্ময়। তারপর আস্তে আস্তে কঠিন গলায় বলল, "ও নাম তুমি শুনলে কোথায়?"

আমি চুপ করে রইলাম।

নীলাঞ্জন বলল, "স্বামীর ওপর আজকাল গোয়েন্দাগিরি করা হচ্ছে নাকি?"

আমার মন বিষিয়ে গেল। অন্যায় অভিযোগ। তাছাড়া এ ধরনের কথা নীলাঞ্জনের স্বভাববিরুদ্ধ।

আমাদের মধ্যে হঠাৎ মহাসমুদ্রের ব্যবধান। দুজনেই চুপচাপ। অবশেষে নীলাঞ্জনই আবার কথা শুরু করল। বলল, গোয়েন্দাগিরির কথায় একটা গল্প মনে পড়ল। কোথায় যেন পড়েছি। গল্পটা বলছি শোন।

আপত্তি জানানো বৃথা। বুঝলাম নীলাঞ্জন খুব ভাল করেই জানে গোয়েন্দা-গিরির গল্প শোনার মত মন তখন আমার নয়। তবু জেনেশুনেই সে গল্পটা বলতে চায়। আর নেহাৎ বাচালতা নয় এই অত্যাচার।

গল্পটার মাথামুণ্ডু আমি কিছুই বুঝলাম না। একজন ভদ্রলোক একটি কাল্পনিক কাহিনী লেখেন। তাতে খানিকটা স্বীকারোক্তির মত জুড়ে দেন। বক্তব্য একটি নিখুঁত খুন করে কেমন করে আইনের চোখে ধুলো দিয়েছেন তিনি। সেই খুনের কোন কিনারা হয়নি। কিন্তু তবুও দিনের পর দিন এক বিচিত্র আতঙ্কে আস্তে আস্তে তাঁর মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে যেতে থাকে। অবশেষে তিনি পাগল হয়ে যান।

এই হল কাহিনীর সূত্রপাত। ভদ্রলোকের স্ত্রী লেখাটি পড়ে কেমন যেন অস্বাভাবিক হয়ে যেতে শুরু করেন। স্বামীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এতদিন বেশ ভালই ছিল। হঠাৎ একদিন তিনি স্বামীকে বলেন, 'তাঁদের বয়স হয়েছে। এখন

আর এক বিছানায় শোয়া ঠিক নয়।'

ভদ্রলোক বুঝলেন ব্যাপার বেগতিক। বললেন, 'ঠিক আছে।' তারপর ভদ্রমহিলা একটার পর একটা অদ্ভুত কাণ্ড করতে লাগলেন। খাবার টেবিলে স্বামী ভদ্রলোকটি লক্ষ্য করতে লাগলেন খাবার জিনিসে তিনি মুখ না লাগালে তাঁর স্ত্রী সেটা নিজের পাতে নেন না। রাত্রিবেলা মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে গেলে দেখেন তাঁর স্ত্রী কেমন ভয়বিহ্বল দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকেন। ভদ্রলোক রোজই মনে করেন স্ত্রীকে কোন মানসিক রোগের চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাবেন। কিন্তু ব্যাপারটা স্ত্রীকে বলতে তাঁর বড় সংকোচ হয়।

একদিন হঠাৎ ভদ্রলোক টেলিফোনে থানা থেকে ডাক পেলেন। থানা অফিসার পুরোনো, পরিচিত। তাঁকে একদিন সন্ধ্যের দিকে থানায় গিয়ে দেখা করতে বললেন।

ভদ্রলোক খুবই অবাক। হঠাৎ থানা থেকে তলব কেন। যাক্ সন্ধ্যের দিকে ও-সি-র কামরায় হাজির হলেন। ও-সি অনেকক্ষণ এটা ওটা নিয়ে গল্প করার পর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা আপনার স্ত্রী কেমন আছেন?'

ভদ্রলোক খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন। লেখক মানুষ। ঘরের খবর বাইরে প্রকাশ করতে বাধো বাধো ঠেকে। তবু বলেই ফেল্লেন তাঁর স্ত্রীর অস্বাভাবিক আচরণের কথা।

ও-সি একটু আমতা-আমতা করে বললেন, 'দেখুন, আপনার স্ত্রী কিছুদিন আগে আমার কাছে এসেছিলেন। যা বললেন শুনে তো আমি একেবারে থ মেরে গেলাম মশায়। ভদ্রমহিলা বলেন কি না উনি ভাল করে জানেন আপনি সাংঘাতিক একটা খুন করেছেন। আমাকে বললেন অনুসন্ধান করতে। না হলে আপনি নাকি আবার খুন করবেন। আর এবার আপনার শিকার হবেন আপনার স্ত্রী নিজে।

আমি ব্যাপারটাকে প্রথমে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু আপনার স্ত্রী নাছোড়বান্দা। রোজ টেলিফোন করছেন। ভয় দেখাচ্ছেন আমি কিছু না করলে উনি হোম মিনিস্টারের কাছে লিখবেন। তাই বাপারটা আপনাকে জানালাম। একটা কিছু আমাকে করতেই হবে। রুটিন এনকোয়ারি আর কি।'

যাক্ ও-সির সঙ্গে এই ধরনের কথাবার্তা হবার পর ভদ্রলোক বাড়ী ফিরে এলেন। স্ত্রীর অস্বাভাবিক ব্যবহারের কারণটা তাঁর কাছে এখন পরিষ্কার হয়েছে। কিন্তু তাঁর স্ত্রীর মনে তাঁর সম্বন্ধে এরকম একটা সন্দেহ জাগল কেন সেটা তিনি বুঝতে পারলেন না। দিন যায়, একদিন গভীর রাতে স্ত্রী হঠাৎ মারা গেলেন। সকলেই জানলেন স্বাভাবিক মৃত্যু। কিন্তু ও-সির মনে কেমন একটা খটকা লাগল। তারপর আরও অনেকদিন গেল। হঠাৎ কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে এল। পুলিশ জানতে পারল ভদ্রলোক শুধু তাঁর স্ত্রীকেই হত্যা করেন নি, তার আগেও একটা খুন করেছেন। ভদ্রলোকের ফাঁসি হয়ে গেল।

একটা সিগারেট ধরিয়ে নীলাঞ্জন চুপ করে রইল। তারপর তার সেই বিষণ্ণ হাসি হেসে আমাকে জিজ্ঞেস করল, "গল্পটা কেমন লাগল শ্যামলছায়া?"

নামটা শুনে আবার নতুন করে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠলাম। বললাম, "যত সব বাজে গাঁজাখুরি গল্প। কোন মানেই হয় না।"

নীলাঞ্জন বলল, "হ্যাঁ। খুব বাজে গল্প। ইংরেজীতে যাকে বলে লং আর্ম

সব কোইনসিডেন্স। যুক্তির বালাই নেই।" তারপর কিছু না বলে উঠে চলে গেল।

আমি চুপ করে বসে রইলাম। হঠাৎ এই কাহিনী শোনাল কেন আমায় সে। আমার একটা ষষ্ঠেন্দ্রিয় কাজ করে ওর সম্বন্ধে। আমি বুঝতে পেরেছি ওই গল্প ও কোন বইতে পড়েনি। ওটা ষোলো-আনা ওর বানানো। কিন্তু সুধাময়ের সঙ্গে এ গল্পের কি যোগাযোগ। আমার কান্না আসে। ও কেন আজও আমার কাছে রহস্য হয়ে রইল।

১৬

আজ সমুদ্র একেবারে পুকুরের মত ঠান্ডা। গুমোট গরম পড়েছে। নিজের কামরায় বসে ইনস্পেক্টার পট্টনায়ক কলম চিবুচ্ছেন। মুখটা ওর কেমন থমথমে, চিন্তামগ্ন। কপালটা দেখে মনে হয় তার ওপর দিয়ে লাঙল চাষ হয়ে গেছে। আজ নীলাঞ্জনের সংগে কথা বলতে পট্টনায়কের ভাল লাগে। ইন্টারেস্টিং মানুষ। কেমন রহস্যময় ব্যক্তিত্ব। সেপাই গিয়ে এরি মধ্যে কয়েকবার খোঁজ করেছে। দরজা বন্ধ। এত বেলা পর্যন্ত ঘুমোচ্ছে স্বামীস্ত্রী? পট্টনায়ক একটু অবাক হন। ওদের দাম্পত্য জীবনের কথা ভাবেন। একটা বোঝাবুঝির সম্পর্ক ওদের মধ্যে। কোন উচ্ছাস নেই, বাড়াবাড়ি নেই—হয়তো উদ্ধত যৌবনের দৃষ্টিতে একটু নিরুত্তাপ। কিন্তু পট্টনায়ক তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থেকে শিখেছেন দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের জন্য উত্তপ্ত প্যাশনের চেয়ে বোঝাবুঝির দাম বেশী।

পট্টনায়কের মেজাজটা হঠাৎ খিঁচড়ে যায়। দেবারতির কথা মনে পড়ে। মনে মনে ওঁকে নস্যাৎ করেন। কেসটার কোনই সুরাহা করতে পারলেন না আজ পর্যন্ত। ডেপুটি কমিশনার তো কাল বেশ দু কথা শুনিয়ে দিয়েছেন। নানা দিক দিয়ে চাপ আসছে। পট্টনায়ক যে তিমিরে সেই তিমিরেই। আসলে রহস্যটা কেমন যেন খাপছাড়া। পাত্রপাত্রী অনেক। কিন্তু কারো ওপরেই সন্দেহ ঘনীভূত হল না এ ক'দিনে। মোটিভ। মোটিভ খাড়া করান যায় অনেকগুলো। কিন্তু কোনটাই শেষ পর্যন্ত ধোপে টিকছে না। পট্টনায়কের সামনে একটা দুর্ভেদ্য পাঁচিল যেন।

পট্টনায়কের চিন্তায় ছেদ পড়ল। আস্তে আস্তে ঘরে এসে ঢুকলেন শ্যামলী-দেবী। শ্যামলীদেবীকে অসম্ভব অসুস্থ লাগছে কেন? এ কি চেহারা হয়েছে ভদ্রমহিলার—চোখ দুটো অস্বাভাবিক লাল। ফোলা ফোলা। সমস্ত শরীর ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে যেন। শ্যামলীদেবী খুব নীচু গলায় বললেন, "মিঃ পট্টনায়ক, আমার স্বামী আপনাকে এই চিঠিটা দিতে বলে গেছেন। লম্বা চিঠি। পড়লে আপনার দুশ্চিন্তা বোধহয় দূর হবে। ও চিঠিতে কি লেখা আছে আমি জানি। তাই বলছি।"

মিঃ পট্টনায়ক আস্তে আস্তে চিঠিটা খুললেন। তারপর নিবিষ্ট হয়ে গেলেন কালো অক্ষরগুলোর মধ্যে।

"পট্টনায়ক সাহেব,

রহস্যভেদের কাজ কতদূর এগোল? অন্য সময় হলে আপনাকে একটা চ্যালেঞ্জ দিতাম। দেবারতির খুনীকে ধরা আপনার কাজ নয়। আপনার বুদ্ধির দোষ নয়। দেবারতিদেবীর মৃত্যুর পেছনে রয়েছে এক দীর্ঘ ইতিহাস। সে ইতি-

হাসের টুকরোগুলো হয়তো আপনি কোনদিন খুঁজে বের করতে পারবেন। কিন্তু সেগুলোকে জুড়ে একটা কার্যকারণ সম্পর্ক আবিষ্কার করা দুঃসাধ্য।

ব্যাপারটা সব আমার জানা। কারণটা খুব সহজ। আমিই এ রহস্যের মেঘনাদ। আমিই রতিদেবীকে খুন করেছি। ওকে ব্ল্যাকমেইল করার আমার কোনই উদ্দেশ্য ছিল না। আমার খুন করার পেছনে ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র মোটিভ। যেমন বলেছিলাম, খানিকটা প্যাশন, খানিকটা ফিলসফির পাণ্ড। এণ্ড দেয়ারবাই হ্যাংগ্স্ এ টেল।

আপনি হয়তো বলবেন মুখোমুখি আপনার সঙ্গে আলোচনা করা উচিত ছিল। হয়তো সেটা ঠিক। কিন্তু কি জানেন, পুলিশকে আমার ছোটবয়স থেকেই খুব ভয়। মনে আছে ছোটবেলায় এস-পি সাহেবদের বাড়ী যেতে আমি খুব ভয় পেতাম। তাঁদের কুঠির গেটে সব সময় একজন সেপাই মোতায়েন থাকত। আপনিও বহু সেপাই-এর দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। আপনাকে ভয় পাই একশগুণ বেশী।

তাই আজ আপনার মুখোমুখি হলাম না। এবার ফাঁকি দিয়ে কাজ হাসিল করাই আমার মতলব। আশাকরি অপরাধ মার্জনা করবেন।

আজ আমি আপনার কাছে আত্মপ্রকাশ করতে চাই। পুলিশী জীবনে হয়তো আমার একটা কথাই আপনার কাজে লাগবে। আমি যখন রতিদেবীকে খুন করি তখন জেনেশুনেই করি। আমার মানসিক অবস্থা যাই থাক, আমার উদ্দেশ্য আমার কাছে একটুও অস্পষ্ট ছিল না। রতির ঐ কালো ওড়নাটা দিয়ে ওর গলায় আস্তে আস্তে চাপ দিতে দিতে ওর লীলাখেলায় পূর্ণচ্ছেদ টেনে দেওয়া।

এ কাহিনীর শুরু অনেক বছর আগে। তখন দেবারতি বলে কোন মেয়ের অস্তিত্ব আমার জানা ছিল না।

জানতাম আর একটি মেয়েকে। নাম তার সীতা। সীতা আর রতির মধ্যে চেহারা, স্বভাবচরিত্রের আসমান জমিন তফাৎ। কিন্তু সীতার কথা না জানলে রতির মৃত্যু আপনি বুঝতে পারবেন না।

সেইজন্যই তো বললাম পট্টনায়ক সাহেব, এ খুনের কিনারা করা আপনার ক্ষমতায় কুলোত না। সীতার সঙ্গে রতির যোগসূত্র আপনার কেন, সবার বুদ্ধির বাইরে। আমি হমিসাইডাল মেনিয়াক নই, ঠিক সেক্স কিলারও নই. যদিও আমার ক্রাইমে সে কেসের ভূমিকা নেহাৎ সামান্য নয়। আমার হত্যার পেছনে একটা মোটিভ ঠিকই ছিল। কিন্তু রতির সাদা গলায় কালো রেশমের ফাঁস পরানোর সময় আমার মনে ঠিক কি ছিল তা আপনার তীক্ষ্ন যুক্তিবাদী মন কোনদিনও আবিষ্কার করতে পারত না। আমি তাহলে বলি সেকথা।

সীতাও মারা গেছে। সীতা বেশ ক বছর আগে আত্মহত্যা করে। স্টোভ ফেটে ওর মুখের একটা দিক পুড়ে কালো হয়ে যায়। কলেজে পড়ার সময় যে ভালবাসার উন্মেষ, পথে-প্রবাসে যে প্রেম আমাকে সব প্রলোভন থেকে সরিয়ে রাখত, সামান্য কয়েক সেকেণ্ডের একটা দুর্ঘটনায় সে ভালবাসায় ফাটল ধরল। সীতা যখন বুঝল আমার মানসিক সংঘাতের কথা, সে নিজেই গলায় দড়ি দিয়ে সব সম্পর্ক চুকেবুকে দিল।

সীতা আত্মহত্যা করে আমাকে মুক্তি দিতে চেয়েছিল। তার বোঝার ভুল হয়েছিল। আকস্মিক মৃত্যুর স্মৃতি ভালবাসার কান্নাহাসির থেকে অনেক বেশী-দিন টিঁকে থাকে। যদি আবার তাতে খানিকটা নিজের অপরাধবোধ থাকে

তাহলে তো কথাই নেই। সীতার মৃত্যুর পর আমি বেঁচে থেকে মরে যাওয়ার চেষ্টা করি বছরের পর বছর। সমস্ত হৃদয়বৃত্তিগুলো সাময়িকভাবে ঝেড়ে ফেলে মদ আর উত্তেজনা নিয়ে সময় কাটাই। দিনের ভাঁটার শেষে যখন রাত্রির জোয়ার আসত তখন কিন্তু আমার চেতনা অস্বাভাবিক রকমের তীব্র আর অনুভূতিশীল হয়ে উঠত। দিনে দিনে তার তীব্রতা বাড়তে বাড়তে একদিন আমার সমস্ত মানসিকতাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। আমার বোধশক্তি ঠিকই রইল। শুধু বাস্তব-বোধটা বড় একটা নাড়া খেল। সেই আমার দ্বিজগৎবাসী মনের প্রথম পদক্ষেপ।

ডাক্তারেরা একেই বলেন হ্যালিউসিনেশন। কিছু না বুঝতে পেরে মনে করেন হয় তো অতিরিক্ত মদ্যপানের ফলে এ রোগ। যাদের মনে অভিজ্ঞতা আর অনুভূতির নিষ্পেষণ নেই তাঁদের কি এ রোগ হতে পারে, যতই মদ খান না কেন তাঁরা? আমার মনের ওপর কিন্তু আমার সম্পূর্ণ কন্ট্রোল ছিল একটা ব্যাপারে। এক মানসিক চিকিৎসকের সঙ্গে আমার হ্যালিউসিনেশন নিয়ে অসুস্থ অবস্থায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করেছি। ইচ্ছে করে তাঁকে পদে পদে বিভ্রান্ত করেছি। তারপর তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার আত্মসমর্পণ করেছি আমার দ্বিচারী মনের কাছে। একটা জিনিস কিন্তু টের পেতাম। দীর্ঘ হ্যালিউ-সিনেশন অনেকটা নাটকের মত। একটানা একই তালে বাজে না তার আবহ-সংগীত। উত্থান-পতনের একটা রিদ্‌ম-এ বাঁধা ঘটনাপ্রবাহ। মন এবং চেতনা যখন ভিন্ন পথগামী তখনও কিন্তু প্রতিক্রিয়া খুবই স্বাভাবিক হওয়া সম্ভব। যেমন হ্যালিউসিনেশন যখন পছন্দসই তখন মনে উল্লাস জাগে, যখন প্রতিকূল তখন আসে ভয় কিংবা বিষাদ। আর একটা জিনিসে অবাক হয়েছি। মনো-বিকলনের পরিনতি যে কাল্পনিক জগতে, সেখানে কিন্তু অনবদ্য যুক্তির শৃংখলা। হ্যালিউসিনেশনের মাত্রা যতই চড়ায় উঠুক, আমার কাল্পনিক সংলাপের পাত্র-পাত্রীরা কখনও যুক্তিবোধ হারাত না। আমার পাগলামির প্রকাশে পাগলামির স্থান ছিল না। আমি জানিনা ডিলিরিয়াম ট্রেমেন্সে এতটা কাল্পনিক বৈচিত্র্য থাকে কিনা। শুনেছি তার পরিণাম নিরবচ্ছিন্ন বিভীষিকা। আমি ভাবি যে মদ্যপের জীবনে অভিজ্ঞতার তীব্রতা নেই তার হ্যালিউসিনেশনে কি করে তীব্রতা আসবে। সেখানে ভুল দেখার ভেতর মনের ছাপ কতটুকুই বা থাকতে পারে।

সীতার মৃত্যুর কিছুদিন পর হ্যালিউসিনেশন আমাকে পেয়ে বসে। সে এক নিদারুণ যন্ত্রণা। শুধু কাল্পনিক দুঃখ আর ভীতিই নয়, ছিল স্বাভাবিক জগতের কাছে কাল্পনিক জগতের কিছু কিছু অতি গোপনীয় কথা লুকিয়ে রাখার মানসিক ক্লান্তি। দিনের পর দিন মনোবিকলনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। কখনও কখনও বর্ডার লাইনে পেঁছে যেতাম। বিকলনটা বিকলন বলেই মনে হত না। জানেন, অনেকদিন পরও কারুর সঙ্গে কথা বলতে গেলে পুরোনো কথার জের টানতে গিয়ে মনে সংশয় হয়েছে—সেকথা আমি সত্যি সত্যি শুনেছি না তার অস্তিত্ব ছিল শুধু আমার ভ্রান্তিবিলাসে।

সেই প্রথম আক্রমণই হল সবথেকে মারাত্মক। মনে আছে একটা রাত আমি ঠায় দোরগোড়ায় চেয়ার নিয়ে বসেছিলাম। আমার তখন বিশ্বাস সীতা একবার এসে দরজা না খোলা পেয়ে ফিরে গেছে। আবার যেন তাকে ফিরে যেতে না হয়। তাই প্রতীক্ষা। সেদিন সারারাত সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় আমার একবারও মনে আসেনি সীতা মারা গেছে।

আর একদিন বিভীষিকা। ছোট বয়স থেকেই আমার কুকুরের ভয়। সেই রাতে দেখলাম দুটো প্রকাণ্ড কুকুর দেয়াল বেয়ে উঠে আমার দোতলার ঘরের জানালা থেকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। এই আমার কাঁধে ঝাঁপিয়ে পড়ল বলে, এক্ষুনি আমাকে ছিঁড়ে দু টুকরো করে ফেলবে। আমার জ্ঞান কিন্তু একদিকে তখনও খুব টনটনে। কাল্পনিক কুকুরের ভয়ে অস্থির, অথচ ঠিক জানি বন্দুকটা কোথায় আছে। বন্দুক, বন্দুক বলে সেদিকে ছুটে গেলাম। পরদিন সকালে সব শান্ত। কিন্তু তখনও আমার ধারণা কুকুর ঠিকই এসেছিল।

আর এক রাত্রে মাথায় ঢুকল দরজায় পুলিশের গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে। সবাই চাপা গলায় বলছে—ঐ, ঐ লোকটা সীতার মৃত্যুর জন্য দায়ী। তাই পুলিশ ওকে গ্রেফতার করতে এসেছে। আমি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাথরুমে খিল দিয়ে বসে রইলাম।

পরদিন রাতে আর এক অধ্যায়। শুনলাম সীতা খিল খিল করে হাসছে। বিদ্রূপ-মাখানো হাসি। সে বলছে, "আমি মরতে পারলাম, আর তোমার সামান্য থানায় যেতে এত ভয়?" আমি মরীয়া হয়ে ঠিক করলাম আমারও সেই শেষ রজনী। কে যেন কানে কানে ফিসফিস করে বলল, "এক গ্লাস ব্রাণ্ডিতে ঘুমের ওষুধ গুলিয়ে নিয়ে গিলে ফেল। কাল সকালেই সব লীলা সাঙ্গ হবে।" আমি তাই করলাম। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। শান্ত, নিরুদ্বেগ মনে নিশ্চিত মৃত্যুর জন্য প্রহর গোনা। সীতার সঙ্গে কথা বলে যাচ্ছি স্বাভাবিক মানুষের মত। সেও জবাব দিয়ে যাচ্ছে। সীতা একটা রবীন্দ্রসঙ্গীতের একটা কলি গুন গুন করে গাইল। আমার অপরিচিত লাইন। কিন্তু পরে মিলিয়ে দেখেছি লাইনটা সত্যি সত্যি আছে। আমার মনের কোন গহন গভীরে লুকিয়ে ছিল।

একদিন হঠাৎ হ্যালিউসিনেশন একটা নতুন মোড় নিল। মাঝে মাঝে আমি ঘুমিয়ে পড়তাম। সেদিন একটানা অনেকক্ষণ ঘুমোনোর পর উঠে শরীরটা বেশ তাজা লাগছিল। চারদিকে তখন অন্ধকার নেমে এসেছে। বিকেল আর সন্ধ্যার এই মাঝামাঝি সময়টাতে এমনি একটা বিষণ্ণতা আসে। হঠাৎ আমার বুকটা দুরুদুরু করতে লাগল কিসের একটা অজানা আশংকায়। তারপর কানে ভেসে এল কয়েকটা কথা। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আত্মীয়-স্বজনদের কথা হচ্ছে। আশ্চর্য! কি স্পষ্ট সে কথাগুলো, কত পরিষ্কার সব গল্প শুনতে পেলাম। ভয়াবহ সব কথা। ডাক্তারবাবু বললেন, 'না, আর তো কোন উপায় দেখছি না। সাইকায়াট্রিস্ট ভদ্রলোক তো আর কোন কথা শুনতে চাইছেন না। বলছেন এবার সার্টিফাই করতে হবে।' মা বললেন, 'সার্টিফাই মানে কি?'· ডাক্তারবাবু বললেন, 'না, কিছুদিন ওকে হাসপাতালে থাকতে হবে আর কি।' দাদা ফোঁস করে উঠলেন। 'মা-র কাছে আর ঢেকে কি হবে ডাক্তারবাবু। হাসপাতাল টাসপাতাল বলে কি লাভ? ওকে কোথায় রাখবেন? লুম্বিনী না রাঁচি যেতে হবে?" হঠাৎ অখণ্ড নীরবতা নেমে এল।

সে নীরবতা যে কি ভয়ঙ্কর তা আপনাকে বোঝাতে পারব না পট্টনায়ক সাহেব। রাঁচি যাওয়া নিয়ে মানুষ যে ঠাট্টা করে তা যে কতটা নির্মম তা সেদিনই টের পেলাম। হঠাৎ কে যেন বলল, 'পালাও নীলাঞ্জন। তোমাকে ওরা বেঁধে নিয়ে যেতে আসছে। পালাও অতি সন্তর্পণে।' ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

তারপর রাস্তায়। হাঁটতে লাগলাম দিশাহীনের মত। কতক্ষণ যন্ত্রের মত হেঁটে গেছি জানি না, সম্বিৎ যখন ফিরে এল দেখি কেওড়াতলার শ্মশানের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। মাথার শিরাগুলোর দপদপানি একটু কমল যেন। বহুদিন পর এপথে আমি এলাম। মৃত্যু-পথযাত্রীর পথের শেষ। রাত বারোটার মত। ভেতরে ঢুকে হেঁটে চলে গেলাম শানবাঁধান ঘাটের দিকে। কয়েকজন লোক বসে গাঁজা টানছে। আমি গুটিসুটি হয়ে পাশে বসে পড়লাম। লুম্বিনী কি রাঁচীর পাহারাদাররা যেখানেই খুঁজুক না কেন আমায়, কেওড়াতলার শ্মশানঘাটে বোধহয় আসবে না।

পাশে এক ভদ্রলোক বললেন, 'কি ভাই, এক ছিলিম চলবে নাকি? অসুখের জন্য বহুদিন নেশা করিনি। বললাম, 'দিন।' জোরে টান দিলাম কয়েকটা। বললাম, 'আপনাদের এই ধোঁয়ায় আমার মন ভরে না। আমি তরল পথে বিশ্বাসী।

ভদ্রলোক বললেন, 'আরে দূর। মদ আমিও অনেক খেয়েছি। কিন্তু এই ধোঁয়ার কাছে কিছুই লাগে না।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ধোঁয়ায় কি পান?'

ভদ্রলোক মিটমিটি হাসতে লাগলেন। বললেন, 'কি পাই জানতে চাইছেন? কি পাই শুনলে বিশ্বাস করবেন কি?'

আমি ছিলিমে আর এক টান দিয়ে বললাম, 'বিশ্বাস অবিশ্বাস সম্বন্ধে আমার আর পরিষ্কার ধারণা নেই। আপনি বলুন না, দেখি বিশ্বাস করতে পারি কিনা।'

ভদ্রলোক গম্ভীর হয়ে বললেন, 'রোজ নিশুতি রাতে আমি ভগবানকে দেখতে পাই।'

আমি একেবারেই এ ধরনের কথার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। একটু হালকা হওয়ার চেষ্টা করে বললাম, 'ভগবান না ঈশ্বর।'

ভদ্রলোক একটুও আমল দিলেন না আমার রসিকতাকে। গুম হয়ে কি ভাবতে লাগলেন।

আমি বলে ফেললাম, 'আচ্ছা আপনি আমাকে ভগবান দেখাতে পারেন?'

ভদ্রলোক বিনাদ্বিধায় বললেন, 'পারি।'

আমার হঠাৎ যেন কি হয়ে গেল। গাঁজার নেশার বশেই হোক বা অন্য কোন কারণেই হোক ভদ্রলোকের আত্মবিশ্বাস আমার মনেও সাময়িক বিশ্বাস এনে দিল। আমি সম্পূর্ণ নির্ভরতার সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম, 'ক'টার সময় ভগবানের দেখা পাওয়া যাবে?'

উনি বললেন, 'রাত দুটোর সময়।'

তারপর কি উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষা। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। আমি সেই অন্ধকারের পাঁচিল ভেদ করে ওপারে আলো দেখার আশা নিয়ে দু'চোখ খুলে চেয়ে রইলাম। সঙ্গে সঙ্গে চলল গাঁজার ছিলিমে টান দেওয়া। কখন জানি না ক্লান্তি নেমে এল দু' চোখ ভরে। চোখ বুজে গেল এক নিবিড় শান্তির কোমল স্পর্শে। চোখ খুলে দেখি ভোর হয়ে গেছে। পাশের ভদ্রলোকটি কখন চলে গেছেন জানি না। ঐ যাঃ, ভগবান দেখা হল না তো আমার। কিন্তু ভগবান কি এসেছিলেন? আমার আর জানা হল না। পরবর্তীকালে বিপদের সময় বহুবার ঠাকুর নাম জপ করেছি। কিন্তু ঈশ্বর আর দেখা হয়নি।

কেন জানিনা সেদিনের ঐ বিচিত্র অভিজ্ঞতার পর আমার অবিশ্বাসের ভিতটা বেশ খানিকটা নাড়া খেয়ে গেছল। মদ ছেড়ে ভগবদ্বিশ্বাসের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা অবশ্য আমার পক্ষে কোন দিনই সম্ভব হয়নি। কিন্তু তবুও সেদিনের সেই গাঁজাখোর লোকটির কথা কখনোই একেবারে উড়িয়ে দিতে পারিনি। ভদ্রলোক কি নিজে ভগবানকে সত্যি সত্যি দেখেছেন কখনও? যদি না দেখে থাকেন তবে এত জোর গলায় সেদিন কি করে বললেন তিনি আমাকেও ভগবান দেখাবেন? তিনি তো আর জানতেন না আমি হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়ব? আরও সংশয় জেগেছে মনে, ভগবানকে দেখতে পাওয়ার জন্য কি যোগ্যতার দরকার হয় না? যদিও বা উনি ঈশ্বরের মুখোমুখি হতে পেরেছেন ওঁর এই বিশ্বাস হল কি করে যে ভগবান ওঁর অনুরোধে আমাকেও দেখা দেবেন? জল যখন পড়ে পাতা নড়ে, সূর্য যখন রাতের শেষে আবার ওঠে তখন ভগবানই বল বা ঈশ্বরই বল, তাঁকে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করার ভেতর কি বুদ্ধির জোর আছে?

শ্মশান থেকে বাড়ী ফিরে এলাম। একদিন মোটামুটি ভাল হয়ে উঠলাম। শ্যামলী স্বেচ্ছাসেবিকার মত আমার জীবনে এল। আমার মদের প্রয়োজন অনেক কমলো। জীবনে একটা নতুন হিসেববোধ আসল। টিপে টিপে পা ফেলতে শিখলাম। পায়ে শেকল পরতে খুব অসুবিধেও হয়নি। রক্তে এসে গেছে একটা স্থিরতা। কোন কিছুতেই আর আমি আসক্তি দেখাতে পারিনি। নেশাতেও না। শুধু একটা ভয় রয়ে গিয়েছিল। সেই কানে কানে শোনার ভয়। কম হলেও মাঝে মাঝে শুনতে পেতাম সেই অপর রাজ্যের ডাক। সুতরাং বুঝতেই পারছেন সাধারণ মানুষের থেকে ভিন্ন খাতে আমার নিঃসঙ্গ মুহূর্তের ভাবনা-চিন্তার ধারা প্রবাহিত হত।

দেবারতি মেয়েটিকে আমি প্রথম দেখি কয়েক বছর আগে উত্তরবঙ্গের একটা ফরেস্ট বাংলোয়। সে কথা আপনাকে আগেই বলেছি। তখন তার স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে আমার কোনই কৌতূহল হয়নি। শুধু বুঝতে পেরেছিলাম ধোয়া তুলসি পাতাটি নয় ঐ রতি ব্যানার্জি। তারপর দেখলাম তাকে আবার পান্থশালার জানালা থেকে, বিমলবাবুর সঙ্গে ইতিউতি ছুটোছুটি করছে। দেখেই আমার কেমন একটা মানসিক অস্বস্তি হয়েছিল। সীতার আকস্মিক মৃত্যুর পর কোন মেয়ের মধ্যে চটুলতার আভাস পেলেই আমি ক্ষেপে যেতাম। মনে হত, সীতার মত মেয়ে তার নিখাদ ভালবাসা নিয়ে বেঁচে থাকতে পারল না। আর এইসব মেয়ে যারা ভালবাসা নিয়ে অভিনয় করে তারা বেঁচে থাকে কোন্ অধিকারে? আমার নৈতিক বিচারে সেই মুহূর্তেই দেবারতির প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা হয়ে গেল।

তারপর একদিন রতির সঙ্গে আলাপ হল কোনার্কের ঝাউবীথিতলে। সেখানে দেখলাম দেবারতির আর একটি রূপ। সে শুধু চটুল নয়, চতুরাও বটে। কথার জাল ফেলে সে আমাকে জানিয়ে দিল, তার সঙ্গে ফরেস্ট বাংলোতে আমার ক্ষণিক সাক্ষাতের কথা তার স্বামীর কাছে ফাঁস করে দিলে সে সেটাকে ব্ল্যাকমেইল মনে করবে। সে যেন এক রকম সম্মুখ সমরে আহ্বান করল আমাকে। বোধহয় সে পরখ করে দেখতে চেয়েছিল আমার মাথায় কোন মতলব আছে কিনা। খুব ভুল চাল খেলল একটা। আমি এ ধরনের কোণ ঠাসা হতে একে-বারেই পছন্দ করি না। পরে বোধহয় নিজের ভুল খানিকটা বুঝতে পেরেছিল সে। তাই ধৌলাগিরিতে সে অন্য পথ নিল—দৈহিক আবেদনের পথ।

এবার একটা মারাত্মক ভুল করল দেবারতি। নিজের দুর্বলতার কথা সে বোধহয় একদম ভুলে গিয়েছিল সেই মুহূর্তে। ধৌলাগিরির পবিত্র সোপানতলে আমার গায়ে ঢলতে গিয়ে মনের ওপর তার বাঁধন সাময়িকভাবে সম্পূর্ণ আলগা হয়ে গেল। একই পুরুষের সঙ্গে দিনের পর দিন রাত কাটাতে রতি ব্যানার্জি স্বভাবত হাঁসফাঁস বোধ করত। বিয়ের পর হয় তো বা কিছুদিন সে সোজা পথে চলার চেষ্টা করেছিল। পদস্খলনের কোন কথা অন্তত আমার জানা নেই। কিন্তু পদস্খলন ছিল অবশ্যম্ভাবী। শেষ পর্যন্ত আমার সঙ্গে প্রেমের খেলা খেলতে গিয়ে সে নিজেই ঘায়েল হল। ধৌলাগিরিতে একটুকু ছোঁয়া তার মনে আগুন জ্বালিয়ে দিল। সে হয় তো নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল, কিন্তু পরিশেষে প্রবৃত্তি জিতল। প্রমাণ পেলাম সেই রাতেই।

সন্ধ্যাবেলা ফিরে এসে বেশ খানিকটা ড্রিংক করেছিলাম। খাবার পর বেরিয়ে পড়লাম সমুদ্রের দিকে। নিঝুম অন্ধকারে আমি নিঃসঙ্গ একাকী। সমুদ্রের সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বললাম। কত দূরে ওর শেষ জানি না, জানি না কত সে গভীর। সংলাপে ছেদ পড়ল। পাশে এসে দাঁড়াল দেবারতি। একেবারে গা ঘেঁষে। পরনে তার কালো সিলকের শাড়ি। গলায় কালো সিলকের ওড়না একটা। অমাবস্যার অন্ধকারেও ওর ফরসা মুখ আর শরীরের অনাবৃত অংশ মোমের মত পেলব, কোমল লাগছিল। বলতে লজ্জা নেই, আমার সেই কিঞ্চিত হুইস্কি-সিঞ্চিত হৃদয়ে একটা চাপা উল্লাসের স্পর্শ পেলাম। দেবারতির দেহ সেই মুহূর্তে আমার কাছে পরম লোভনীয় মনে হল।

দেবারতি বলল, "বিমল ঘুমিয়েছে। ওর কফিতে আমি একটা ঘুমের ওষুধ দিয়ে দিয়েছি। সারারাত ঘুমোবে, কিছু ক্ষতি হবে না। আজ রাতে আমাদের কেউ বিরক্ত করতে আসবে না।"

আমি বললাম, "আপনার কি আমাকে কিছু বলার আছে? আপনার কোন ভয় নেই। আপনার আর দেবেশের সম্বন্ধে কোন কথা আমি বিমলবাবুকে বলব না। বলার কোন ইচ্ছে কখনই ছিল না। পরচর্চা আমার লাইনে আসে না।"

দেবারতি খিলখিল করে হাসল। বলল, "পরচর্চা তো লাইনে আসে না। পরস্ত্রী চর্চাতে কি আপত্তি আছে কিছু?"

আমি সাবধানে বললাম, "তা নির্ভর করে সে কেমন পরস্ত্রী। আর চর্চা বলতে আপনি কি বোঝেন তার ওপর।"

রতি হঠাৎ ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে ফেলতে আমার কাছে এগিয়ে এল। ফিসফিস করে বলল, "এই, এই বুঝি," বলেই দু-হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরল। ওর শরীরে কেমন একটা মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ। কোন দামী পারফিউম হবে। তারপর আমার সব প্রশ্ন, সব আপত্তি থামিয়ে দিল। আমার মুখে ওর দু ঠোঁট চেপে ধরল। আমার দাঁতের ফাঁক দিয়ে মুখের গহ্বরে ওর জিভ প্রবেশ করল। জিভের উষ্ণ স্পর্শে আমার সমস্ত শরীরে লালসার বান ডাকল যেন। আমার দু হাতে দলিত মথিত হল ওর নরম শরীর।

উত্তেজনায় আমার কপালের শিরাগুলো ফেটে যাচ্ছিল যেন। হঠাৎ আমার চোখে ভেসে উঠল আর একটি দৃশ্য। এমনি করে আমার শরীরের সঙ্গে ঘন আলিঙ্গনে আবদ্ধ আর একটি বহু-ব্যবহৃত দেহ। হঠাৎ কেমন যেন মাথাটা ঘুরে গেল আমার। সময়ের ব্যবধান নিমেষে মিলিয়ে গেল। দশ বছর আগের সেই

দ্বিচারিত্বে ফিরে গেল আমার মন। বাস্তব অবাস্তবের সীমারেখা অমাবস্যার অন্ধকারে বিলুপ্ত যেন। কানে স্পষ্ট ক'টি কথা। সীতার নির্দেশ। "তোমার শরীরে ও কার শরীর লেপটে আছে নীলাঞ্জন? ও তো আমি না। শেষ করে দাও ওকে, এক্ষুনি শেষ করে দাও।" সেই মুহূর্তে আমার মনে সীতার নির্দেশ অমান্য করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। যেমনভাবে দশ বছর আগে বিনাদ্বিধায় ব্র্যাণ্ডি আর ঘুমের ওষুধ এক সঙ্গে খেয়ে নিয়েছিলাম মরণের অপর পারে সীতার সঙ্গে মিলিত হব বলে, সেই রাত্রেও ঠিক তেমনি আমি সীতার কথামত রতিকে শেষ করে দিলাম। আমার হাতে খেলাচ্ছলে কালো ওড়নাটা এসে গিয়েছিল কখন জানি না। উন্মত্তের মত ওড়নাটা ওর গলায় জড়িয়ে টানতে লাগলাম। ওর যে জিভ কিছুক্ষণ আমার মুখের ভেতর সাপের মত নাচছিল তা আস্তে আস্তে ঠেলে বেরিয়ে এল। কয়েক মুহূর্তেই রতি ব্যানার্জির খেলা ফুরোল। বিমলবাবু বিপত্নীক হলেন।

তারপর অনেকক্ষণ চুপ করে বসে ছিলাম সমুদ্রতীরে। আত্মপক্ষ সমর্থনে যুক্তির পর যুক্তি খাড়া করলাম। ও কাজটায় আমার নামযশ আছে। ভাবলাম রতির মত মেয়ে পৃথিবীতে শুধু অশান্তি নিয়ে আসে। তাকে খতম করে আমি অনেক পুরুষের জীবন থেকে একটা সম্ভাব্য ট্রাজেডির কালো ছায়া সরিয়ে দিয়েছি। রতির আকর্ষণ যে কি ভীষণ তা তো আমি নিজেই দেখলাম. আর আমি তো অনেকের তুলনায় নিরাসক্ত পুরুষ। আমার এ শৃঙ্খলা ভাঙায় তো নিজের কোন স্বার্থ নেই! এ শুধু শৃঙ্খলা রক্ষার তাগিদে। আমি ধ্বংস করেছি। আমাকে কি খুনী বলা চলে?

কিন্তু পট্টনায়ক সাহেব, নীলাঞ্জন গুপ্ত উচ্চশিক্ষিত জার্নালিস্ট। পরিশীলিত তার মন। রাতের ওই যুক্তি অমাবস্যারাতের জমাট অন্ধকারের মতই দিনের আলোর আঘাতে মিলিয়ে যায়। আইনের হাতে ধরা পড়ি বা না পড়ি সে মুহূর্তেই আমি নিজের কাছে নিজের অপরাধ স্বীকার করলাম। ভাবলাম শ্যামলীকেও বলব। কিন্তু ও সরল সহজ মেয়ে, আমার মনের জটিলতার ভার ওর ওপর চাপাতে মন চাইল না। একদিন ওকে বানিয়ে একটা গল্প বলে বাজিয়ে দেখলাম একটু। তাতে আরও ধাক্কা খেলাম একটা। কিছুদিন স্বাভাবিক জীবনের সঙ্গে একটা কৃত্রিম যোগাযোগ টিকিয়ে রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করলাম। নিরাসক্ত চোখে সকলকে দেখার চেষ্টা করলাম, পারলাম না। আপনাকে দেখলাম, সরল বিশ্বাসে আমার সঙ্গে কেসটা আলোচনা করছেন। আপনার বুদ্ধির প্রতি আমার শ্রদ্ধা জাগল—বুদ্ধির দাম আমার কাছে খুব বেশী। কিন্তু বুঝলাম সত্যি সত্যি আমার সাহায্য ছাড়া কেসটার নিষ্পত্তি বোধহয় আপনার সাধ্যের বাইরে। দেখলাম সকলের ভয়ার্ত মুখ। শ্যামলী দিনে দিনে শুকিয়ে যাচ্ছে। শুনলাম সিংজীর কাতর আবেদন। কানে এল অপরিচিতা এক অভিসারিকার টুকরো কটি কথা, স্ক্যাণ্ডেলের ভয়ে তার সব সাহস উবে গেছে। সবশেষে বিমলবাবুকে নতুন করে আবিষ্কার করলাম। স্পর্শকাতর একটা মানুষ। রতির হত্যাকারীর সম্বন্ধে তার কি আক্রোশ! আর কারণটা কি অসাধারণ! সবাই আজ আমার কৃত কর্মের ফলে বিপন্ন। মনে পড়ল সুধাময়ের মুখ। আমার সঙ্গে ইস্কুলে পড়ত। আমার দোষ ঢাকতে একবার ওর ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে দিয়েছিলাম। ওর পিঠের ওপর যখন বেত পড়ছিল সপাং সপাং করে, ও আমার দিকে তাকিয়ে ছিল। চোখে ঘৃণা

আর বিস্ময়। রাত্রের অন্ধকারে একা যখন সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকি সুধাময়ের সেই মুখটা প্রকাণ্ড বড় হয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসে।

আমি জানিনা আপনি আমাকে খুনী বলে কোনদিন সন্দেহ করেছেন কিনা। একদিন তো খোলাখুলি কথা হয়েছিল এ নিয়ে। কিন্তু মনের গভীরে? সন্দেহ থাকলেও প্রমাণ আপনি পেতেন না। আমি যদি আপনার কাছে আত্মসমর্পণ করতাম তবে মামলার ফল কি দাঁড়াত? আমাকে কি মানসিক অসুস্থতার দায়ে ফাঁসি থেকে রেহাই দেওয়া হত? সে বড় অপমানের ব্যাপার হত। নীলাঞ্জন গুপ্তের মাথার ঠিক নেই! সইতে পারতাম না। তাই এ পথ বেছে নিলাম।

সাঁতার কাটতে জানিনা বলে সমুদ্রের জলে আমি কোনদিন পা ডুবোই নি। ভেবেছিলাম কোনদিনই জলে নামব না। ভুল করেছিলাম। আজ চলি। জীবনের প্রথম এবং শেষ সমুদ্রস্নানে।

নমস্কারান্তে,
ইতি
নীলাঞ্জন গুপ্ত।"